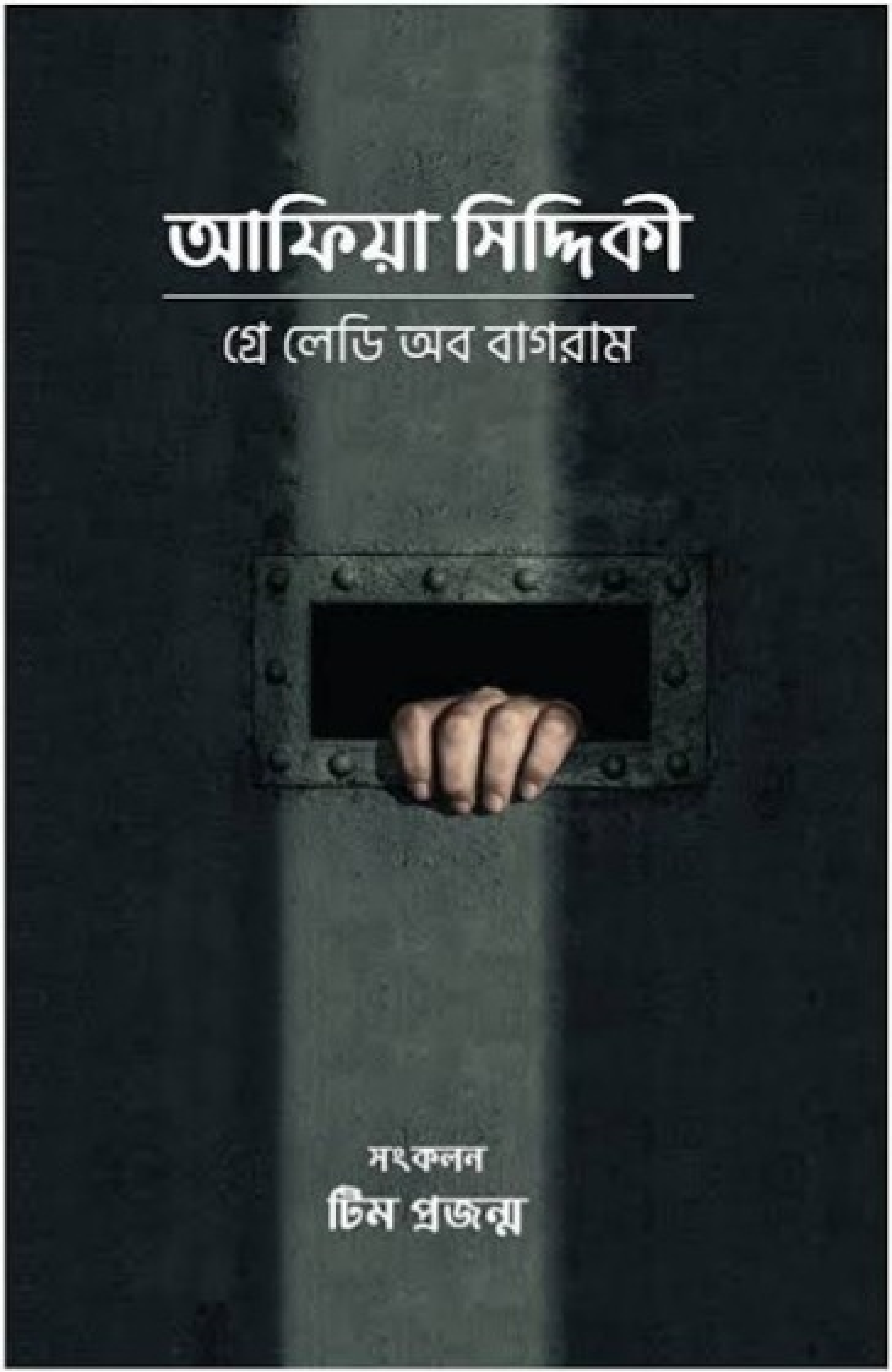

আফিয়া সিদ্দিকী

গ্রে লেডি অব বাগরাম

সংকলন

টিম প্রজন্ম

আফিয়া সিদ্দিকী
গ্রে লেডি অব বাগরাম

প্রকাশকাল
মে ২০১৯
প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

Afia Siddique: The Gray Lady of Baghram

Published by Projonmo Publication

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

ISBN: 978-984-34-6698-3

প্রকাশকের কথা

‘গ্লোবাল রিসার্চ: সেন্টার ফর রিসার্চ অন গ্লোবালাইজেশন’ থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয় ১৯৪৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকার হাতে নিহতের সংখ্যা ২০ মিলিয়নেরও বেশি! কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছেন মার্কিন ইতিহাসবিদ জেমস এ লুকাস। রিপোর্টটিতে বলা হয় ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ নিহত এবং নিহত প্রতিজনের বিপরীতে ১০ জন আহত হয়েছে। চিকিৎসকদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেটাতে দেখা যায় ২০০৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে ১৩ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে! তথাকথিত মানবতার ফেরিওয়ালাদের হাত কতটা রক্তাক্ত এই দু’টি রিপোর্ট থেকেই এটি স্পষ্ট বুঝা যায়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধের নামে শত শত মানুষের উপরে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র নামে চলা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার ড. আফিয়া সিদ্দিকী যিনি আমেরিকাতেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। তিন সন্তানের জননী আফিয়া সিদ্দিকীকে অপহরণ করে দীর্ঘ পাঁচ বছর গুম করে রেখে অবশেষে আটকের কথা স্বীকার করা হয় ২০০৮ সালে। ন্যায়বিচার এমনকি নূন্যতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এক নারীকে ৭ বছর ধরে সীমাহীন নিপীড়ন ও নির্যাতনের পরে ২০১০ সালে ইউএস ফেডারেল কোর্টে তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়। বিচারের নামে সেই প্রহসনে ৩৮ বছর বয়সী আফিয়াকে ৮৬ বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। ক্যাঙ্গারু কোর্টের এই রায় প্রমাণ করে ‘যুক্তরাষ্ট্রে ন্যায়বিচার এক দূর্লভ বস্তু’।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আফিয়ার জীবনী, অপহরণ, গ্রেফতার নাটক, মামলা ও বর্তমান অবস্থার উপর লেখা। এই বইটির বেশির ভাগ তথ্য আফিয়া সিদ্দিকী: আদার ভয়সেস, পায়াম-ই-হায়া, মুসলিমম্যাটারস ডট অর্গ, আফিয়া মুভমেন্ট

ডট কম, আফিয়া ডট অর্গ থেকে নেওয়া। বিভিন্ন বই ও ওয়েবসাইট থেকে সংকলন করার মতো একটি দূরুহ কাজ সম্পূর্ন করায় টিম প্রজন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও আফিয়া মুভমেন্ট বাংলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা অনুবাদের কাজটা এগিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা কভার ডিজাইন থেকে বাইন্ডিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের।

আশা করি ‘আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম’ বইটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আফিয়া সিদ্দিকীর পরিচয় এবং সকল ঘটনা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি নতুন করে দু’টি জাতি ও দু’টি দেশের মুখোশ উন্মোচনে ভূমিকা রাখবে।

পরিচালক,

প্রজন্ম পাবলিকেশন

একনজরে আফিয়া সিদ্দিকী

THE PHOTO WAS TAKEN AND RELEASED INTO THE PUBLIC DOMAIN BY HER BROTHER MUHAMMAD SIDDIQUI.

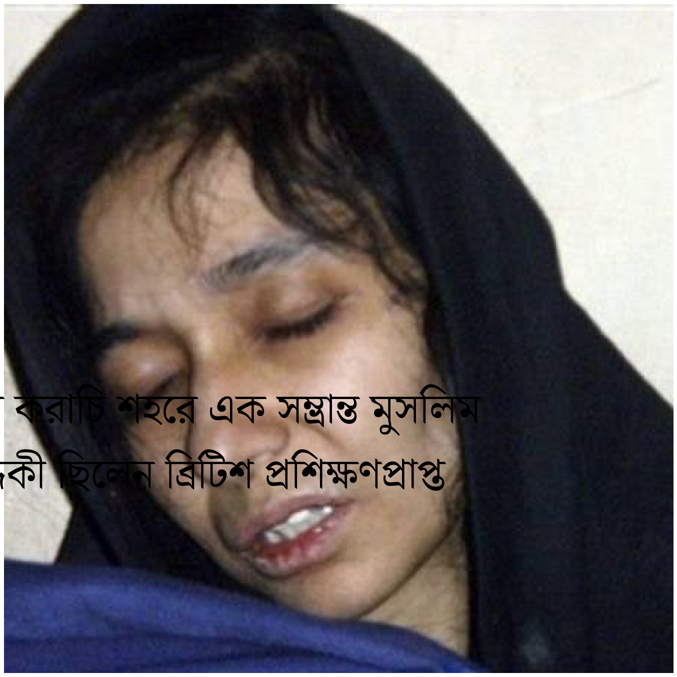

আফিয়া ও তার পরিবার

আফিয়া সিদ্দিকী ১৯৭২ সালের ২রা মার্চ পাকিস্তানের করাচি শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী ছিলেন ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

নিউরোসার্জন। মা ইসমাত সিদ্দিকী বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিন ভাইবোনের মধ্যে আফিয়া সর্বকনিষ্ঠ। বড় ভাই মুহাম্মদ সিদ্দিকী একজন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। বড় বোন ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী হার্ভার্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। আফিয়া সিদ্দিকীর শৈশবকাল কাটে আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়াতে।৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এরপর পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শেষ করেন। আফিয়া সিদ্দিকী পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। একইভাবে বাইবেল আর তোরাহও (খ্রিষ্টীয়ধর্মগ্রন্থ) পড়েছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অগাধ জ্ঞানের জন্য আফিয়াকে তার বোন ‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এনসাইক্লোপিডিয়া’ বলে ডাকতেন।

আমেরিকায় গমন

১৯৯০ সালে আফিয়া সিদ্দিকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার ভাই মুহাম্মদ সিদ্দিকীর কাছে যান এবং টেক্সাসের হাউস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। হাউস্টনে তৃতীয় সেমিষ্টারে থাকাবস্থায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) থেকে ফুল স্কলারশীপ পেয়ে সেখানে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে আফিয়া সিদ্দিকী Islamization in Pakistan & its Effect on Women বিষয়ে গবেষণা করে CARROL L. WILSON AWARD অর্জন করেন এবং পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পান। ১৯৯৩ সালে আফিয়া সিদ্দিকী ক্যামব্রিজ এলিমেন্টারি স্কুল প্রাঙ্গণে ‘সিটি ডেজ’ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ১২০০ ডলার পুরস্কার জেতেন।

গ্রাজুয়েশন ও পিএইচ.ডি. লাভ

আফিয়া সিদ্দিকী ১৯৯৫ সালে এমআইটি থেকে বায়োলজিতে বিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ব্র্যান্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ব্র্যান্ডিজ থেকেই ২০০১ সালে পিএইচ.ডি. করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ‘অনুকরণের মাধ্যমে শেখা’। আফিয়া সিদ্দিকী প্রফেসর নোয়াম চমস্কির তত্ত্বাবধানে

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করেন। প্রফেসর নোয়াম চমস্কি তার সম্পর্কে বলেন, “আফিয়া যেখানেই যাবে সেখানের পরিবেশকেই পাল্টে দেবে।”

দাতব্য ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহন

ড. আফিয়া বসনিয়ার মজলুম নারী ও শিশুদের জন্য একাই এক হাজার ডলার জমা করেন যা সম্ভবত কোনো ছাত্রীর পক্ষ থেকে ফান্ড গঠনের বিশ্ব রেকর্ড ছিল। শত শত বসনিয়ান এতিমকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি আমেরিকায় খুঁজে খুঁজে মুসলিম পরিবার বের করেছেন। তিনি কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্যও এক লক্ষ রুপি জমা করেন। আফিয়া ভদ্রতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার জন্য সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই দানের হাত প্রশ্বস্ত করেন।

কোমল হৃদয়ের অধিকারী ড. আফিয়ার ঘরের অনর্থক পশু-পাখির প্রতিও ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। তিনি চড়ুই পাখির বাচ্চাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখলেও কষ্ট পেতেন। বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি তার ছিল বিশেষ অনুরাগ। আমেরিকায় গিয়েও আফিয়া প্রায়ই বৃদ্ধাশ্রমে যেতেন। বয়স্ক মহিলাদের দেখাশোনা করতেন, গোসল করিয়ে দিতেন, চুল আঁচড়ে দিতেন। কখনো কখনো মানসিক রোগীদেরও সেবা করতে যেতেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। তার বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন এসব প্রতিবন্ধী শিশুর সেবা সে কেন করে, যারা কিনা বিনিময়ে একটা ধন্যবাদও দিতে পারবে না। এদিকে আশ্রমের বৃদ্ধারা অনেকেই তো আরও অকৃতজ্ঞ। পারলে অভিশাপ দেবে। আফিয়া বলেছিল কৃতজ্ঞ লোকের জন্য তো সেবা করার মানুষের অভাব নেই। এই দুর্ভাগা মানুষগুলো কারো কোনো সুনজর থেকে বঞ্চিত। এজন্য আমি তাদের সেবাই করি।

ইসলাম প্রচার

আফিয়া সিদ্দিকী পবিত্র কুরআনের হাফেজা ছিলেন। ইসলামের প্রতি ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। তিনি মনে করতেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ শান্তির প্রত্যাশায় জাহান্নামের

দিকে যাচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের দায়িত্ব হলো তাদের কুরআনের পথ দেখানো। তিনি বলতেন, আমেরিকা আমাকে জাগতিক শিক্ষা দিয়েছে আর আমি আমেরিকার জনগণকে ইসলামের শিক্ষা দেবো। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে ড. আফিয়া তার বোন ড. ফাওজিয়াকে সাথে নিয়ে ইনিস্টিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ এন্ড টিচিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ইনিস্টিউটে কুরআনের দাওয়াতকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বক্তৃতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ড. আফিয়া হাজার হাজার কপি কুরআন বিতরণ করেছেন। বিশেষভাবে কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কুরআন বিতরণ করেছেন। মার্কিন গবেষক ও স্কলার স্টিফেন ল্যান্ডমিন বলেন, "ড. আফিয়া সিদ্দিকীর অপরাধ শুধু একটিই সেটা হলো, সে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ইসলামের প্রচার-প্রসার করেছিলেন।"

বিয়ে ও সন্তান জন্মদান

১৯৯৫ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অ্যানেসথিসিয়াবিদ আমজাদ মোহাম্মাদ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন ড. আফিয়া। এরপর যথাক্রমে আহমেদ (১৯৯৬), মারিয়াম (১৯৯৮) এবং সুলাইমান (২০০২) নামে তিন সন্তান জন্মদান করেন।

পাকিস্তানে ফিরে আসা এবং বিচ্ছেদ

আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে আমজাদ খানের সম্পর্ক খুব ভালো যাচ্ছিল না। ২০০২ সালে তৃতীয় সন্তান সুলাইমান জন্মের আগ মুহুর্তে সেটা প্রকট আকার ধারন করে। আফিয়া তার সন্তানদের নিয়ে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। একই বছর তার বাবা মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। একজন প্রতক্ষ্যদর্শী দাবি করেন, আমজাদ খান আফিয়ার বাবাকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে যান এবং হার্ট অ্যাটাক করেন। কিছু দিন পরে আমজাদ খানের সাথে আফিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

এডুকেশন সিটি গড়ার পরিকল্পনা

ড. আফিয়া দেশের দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থাকে সকল সমস্যার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আফিয়া মনে করতেন, যদি নতুন প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে সজ্জিত করা যায় অর্থাৎ শিক্ষাকে সহজলভ্য করা যায় তাহলে এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন। ২০০২ সালে সরকারের নিকট করাচির পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামদর্দ ইউনিভার্সিটির সন্নিকটে শিক্ষানগরী (Education City) প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্ধের আবেদন করেন। যা অনুমোদনও পেয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের সকল মুসলিম শিক্ষাবিদদেরকে সেই স্থানে একত্রিত করে একটি আদর্শ শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে তরুণ প্রজন্ম গোটা পৃথিবীর আধুনিক ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

অপহরণ

২০০৩ সালের ৩১ মার্চ ড. আফিয়া তার তিন সন্তান, ছয় বছর বয়সী আমেরিকার নাগরিক আহমেদ, চার বছর বয়সী আমেরিকার নাগরিক মারিয়াম এবং ছয় মাস বয়সী সুলাইমান সহ পাকিস্তানের করাচিতে আইএসআই কর্তৃক অপহৃত হন। ৩১ মার্চ ২০০৩ সালে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় যে, আফিয়াকে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। NBC Nightly News সহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যম এর সত্যতা নিশ্চিত করে। অপহরণের পর ড. আফিয়ার মায়ের সাথে সন্দেহভাজন এজেন্সি যোগাযোগ করে। তারা হুমকি দেয়, আফিয়াকে জীবিত ফেরত পেতে চাইলে তার পরিবার যেন মুখ বন্ধ রাখে।

আফগানিস্তানে সন্ধান এবং নাটক

২০০৮ সালের মধ্যে অনেকের মনে এ ধারণা জন্মে যে, নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ বছর পর হয়তো আফিয়া এবং তার সন্তানেরা আর বেঁচে নেই। এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে

ড. আফিয়া নাটকীয়ভাবে গজনীতে ‘আবির্ভূত’ হন। তখন ব্রিটিশ মানবাধিকার ও সংবাদকর্মী ইভন রিডলি এবং বাগরামের সাবেক কারাবন্দি, ব্রিটিশ নাগরিক মোয়াজ্জেম বেগ জনসম্মুখে বাগরাম কারাগারে বন্দি এক নারীর প্রসঙ্গ তুলে আনেন। চিৎকার করে কান্না করা সেই বন্দিনীর নাম তারা রেখেছিলেন ‘গ্রে লেডি অব বাগরাম’ বা ‘বাগরামের ধূসর মহিলা’। মার্কিন কর্তৃপক্ষ আফিয়াকে নিয়ে একটি নাটক সাজায়। বলা হয়, “আফগান বাহিনী আফিয়াকে গ্রেফতার করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মার্কিন সেনারা আফিয়াকে রাখা সেই কক্ষে প্রবেশ করে। এক সৈনিক তার M-4 রাইফেলটি মেঝেতে রাখলে আফিয়া সেটি তুলে নিয়েই চিৎকার করে ওঠে এবং গুলি চালায়। সে সময় আত্মরক্ষার্থে আফিয়ার উপর গুলি চালায় এক মার্কিন সৈন্য।” যদিও পরবর্তীতে তারা এই দাবির স্বপক্ষে শক্তিশালী কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।

নির্যাতন

ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ভয়ানক নির্যাতন চালায়। শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি তার ধর্মকেও অবমাননা করা হয়। একাধিকবার গণধর্ষনের শিকার আফিয়াকে কারাবন্দির নূন্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। তার আইনজীবীর তথ্যানুযায়ী নির্যাতনে তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যায়। মার্কিনীরা তার দেহ থেকে একটি কিডনিও সরিয়ে ফেলে। অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয় যার কারনে তিনি খাবার হজম করতে পারেন না। গুলিবিদ্ধ ক্ষতের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়িয়ে সেলাই করা হয়। অপারেশনের ফলে তার শরীরে অনেকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আদালতে তার উপর চালানো ভয়ঙ্কর নির্যাতনের বর্ণনা দেন আফিয়া। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েও তার উপরে নির্যাতন অব্যাহত থাকে। নিউইয়র্ক ডিটেনশন সেন্টারে ছয়জন পুরুষ সৈন্য তাকে জোরপূর্বক উলঙ্গ করে ধূলোবালি ভর্তি কক্ষ থেকে বাহিরে এনে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ভিডিও ফিল্ম বানানো হয় এবং তাকে বলা হয়, এই ভিডিও

ফিল্ম ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করে পাগল বানানোর চেষ্টা করা হয়। মার্কিন সরকার ‘সেন্ট্রাল কোর্টে’ আবেদন করে কিছু ছবির প্রচারণা নিষিদ্ধ করেছিল যার মধ্যে আফিয়ার উপরে চালানো নির্যাতনের সেই ছবিগুলোও ছিল। জাতিসংঘ ও জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অনুযায়ী, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির উপর কোনোপ্রকার অপরাধের স্বীকারোক্তি চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ ছাড়াও নারীদের সতীত্ব রক্ষা সর্বাবস্থায় জরুরী। চাই তার উপর যে-কোনো অপরাধের অভিযোগ থাকুক। কিন্তু তার বিপরীতে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে STRIP SEARCHING এর নামে পুরুষ সৈন্যদের উপস্থিতিতে উলঙ্গ করা হয়েছে এবং পুরুষ ডাক্তার তাকে তল্লাশি করেছে। সিনেটর মুশাহিদ হুসাইন মিডিয়ায় বলেন, আফিয়ার উপর নির্যাতনে ভয়াবহ এবং বর্ণনাতীত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ড. আফিয়া তাকে জানিয়েছেন, তার উপর মার্কিনীরা ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে।

মিডিয়া মার্কিন কারাগারগুলোতে নারী বন্দিদের সাথে মানবতা বিধ্বংসী কার্যকলাপের ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছে। কারাগারগুলোতে স্ট্রিপ সার্চিং (STRIP SEARCHING) এর নামে নারীদের শ্লীলতাহানি, নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ি খুবই সাধারণ বিষয়। টেক্সাসের যে কারাগারে ড. আফিয়াকে রাখা হয়েছিল তাকে ‘আতঙ্কের ঘর’ বলা হয়। মার্কিন আদালতে এমন মামলাও বিদ্যমান যার মধ্যে টেক্সাসের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্বেই নারীদেরকে ভয়াবহ নির্যাতনের পর মেরে ফেলা হয়। যেন তারা কারাগারের বাহিরের বাসিন্দাদেরকে কারাগারে সংঘটিত ভয়াবহ নির্যাতন সম্পর্কে অবহিত করতে না পারে। বাগরাম কারাগারে আফগান, আরব ও পাকিস্তানি নারীদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা মার্কিন বাহিনীর আরেক অপরাধনামা।

মার্কিন এর্টনি টিনা ফস্টার ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে করাচির হোটেল রিজেন্ট প্লাজায় মানবাধিকার সেমিনারে বক্তৃতাকালে বলেন, বাগরাম কারাগারে বন্দি নারী, শিশু ও পুরুষের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। যাদেরকে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির নিশানা বানানো হয়েছে। যার মধ্যে শতকরা ৯৮% বন্দিই নির্দোষ। যেখানে মার্কিন প্রশাসন সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৬০০ জন বন্দি থাকার কথা স্বীকার করেছে। ইরাকের

আবু গারীব কারাগারে নারীদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা অনেক আগেই মিডিয়ায় এসেছে। মার্কিন সৈন্যরা নারীদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। হাজার হাজার নারী এখনও সিআইএ'র অধিনে প্রতিষ্ঠিত এই কারাগারগুলোতে নির্যাতনের শিকার। বন্দিদের উলঙ্গ ভিডিও বানিয়ে তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়া সিআইএর অনেকগুলো ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি। তাদেরকে শুধু শারীরিকভাবেই নয় বরং মানসিক ও চিন্তাগতভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এমনকি তাদের নূন্যতম মৌলিক অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেই কারাগারগুলোতে।

অভিযোগ ও মামলা

আফগানিস্তানে আফিয়ার উপর গুলি করার পর ৩রা আগষ্ট ২০০৮ আহতাবস্থায় গ্রেপ্তার করে আমেরিকার নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা আগষ্ট ২০০৮ তার বিরুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের উপর আক্রমণের ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয়।

২৭ জুন ২০০৯ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানি ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ইঙ্গিতে তাকে পুনরায় টেক্সাসের মানসিক কারাগার থেকে নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টার (MDC) তে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তাকে একটি খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয় যার সাইজ ৮×৬×৬। যাতে একটি টয়লেট ও একটি ওয়াশ বেসিন রয়েছে। এই সেলকে স্পেশাল হাউজিং ইউনিট (SHU) বলা হয়। যার সম্মুখে দুইজন পুরুষ গার্ড সর্বক্ষণ পাহারা দেয় এবং প্রতি ২০ মিনিট পরপর সেলের দরজা খুলে ভেতরে আসা-যাওয়া করে। সেখানে কোনো রকম পর্দার ব্যবস্থা নাই। মা ও ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় আফিয়া দাবি করেন, কারা কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান সরকারের ইঙ্গিতেই তাকে নির্যাতন নিপীড়নের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছে যেন তাকে দিয়ে তার 'না করা অপরাধের স্বীকারোক্তি' আদায় করা যায়।

আফিয়ার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হলো আমেরিকান সৈন্যদের হত্যাচেষ্টা। অভিযোগটি যদিও হাস্যকর কারন কথিত সেই 'হত্যাচেষ্টায়' কোনো মার্কিন সৈন্যের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগেনি অথচ আফিয়ার পেটে দুটো গুলি করা হয়। আরো অবাক করা বিষয়

হলো আফিয়ার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা সম্ভব হবে আশঙ্কায় এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ করা হয়নি।

পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র

আইএসআই আফিয়াকে তার সন্তানদেরসহ অপহরণ করেছিল এর অসংখ্য প্রমাণ বিভিন্ন সময় মিডিয়াতে এসেছে। অর্থাৎ বিষয়টা এমন নিজ দেশের একজন সম্মানিত নাগরিককে অপহরণ করে আমেরিকার হাতে গোপনে তুলে (বিক্রয়!) দেয় পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানি গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে এটা নতুন কিছু না। এর আগেও শত শত মানুষকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে আইএসআই। যার মধ্যে অন্যতম আলজাজিরার সাংবাদিক সামি আলহায। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় আফিয়া আমেরিকান কারাগারে বন্দি, এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বিষয়টা জনসাধারনের কাছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যখন আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানীর ষড়যন্ত্র সামনে আসে। হক্কানি মার্কিন উকিল লাজ ফিংককে ড. আফিয়ার জামিন করাতে নিষেধ করেন এবং তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। হুসাইন হক্কানির ইশারায় ড. আফিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা ড. আফিয়ার মুক্তির পরিবর্তে উল্টো মার্কিন সরকারের নিয়োগকৃত উকিলের সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করেছেন। সিনেটর তালহা মাহমুদ, যিনি সেই পাঁচ সিনেটর দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা টেক্সাসের মানসিক কারাগারে ড. আফিয়ার সাথে সাক্ষাত করেছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ করাচিতে অল পার্টির গোলটেবিল কনফারেন্সে বক্তব্যকালে তালহা প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. আফিয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখেছে এবং অন্যায় উদাসীনতার প্রমাণ দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কখনই ড. আফিয়াকে ফেরত আনার বিষয়ে একনিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু ড. আফিয়ার সাহসিকতা ও দৃঢ়তার কারণে সৃষ্টি হওয়া জনগণের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য সরকার সংবাদপত্রে লোক দেখানো বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন এর্টনি টিনা ফস্টার ৬ই মার্চ ২০১০ করাচি সফরকালে হোটেল রিজেন্ট প্লাজায়

এক সেমিনারে বলেন, পাকিস্তান সরকার মার্কিন উকিলদের শুধু এজন্য নিয়োগ দিয়েছিল যে, ড. আফিয়াকে যেনো মুক্ত করার পরিবর্তে উল্টো দোষী সাব্যস্ত করা যায়। টিনা ফস্টার আরো বলেন, এই মামলার কোনো আইনী ভিত্তি নেই এবং ড. আফিয়ার উপর আরোপিত অভিযোগগুলো খুব সহজেই ভুল প্রমাণিত করা যেতো। কিন্তু উকিলরা ড. আফিয়ার পক্ষে শক্ত প্রমাণাদিকে ব্যবহারের পরিবর্তে অত্যন্ত হালকা ভূমিকা পালন করেছেন।

হাউস অফ লর্ড বৃটেনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভন রিডলি এবং লর্ড নজির আহমদ ড. আফিয়ার ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের সাথে সাক্ষাত করতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ইভন রিডলি করাচি প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের জানান, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কখনোই রাষ্ট্রীয়ভাবে ড. আফিয়াকে ফেরত আনার ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রস্তাব দেয়নি।

যত অভিযোগ

আমেরিকার দাবি হলো আফিয়া পাকিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র নারী সন্ত্রাসী। তিনি স্বেচ্ছায় একজন মাঠ পর্যায়ের সন্ত্রাসী হিসেবে তার তিন সন্তানকে নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। একই সাথে তিন সন্তানসহ পাঁচ বছর ধরে পরিবার থেকে আলাদা ছিলেন, যেন সবাই মনে করে, তারা এরই মাঝে মারা গেছেন। তারা দাবি করে, আফিয়া এমন কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে তার বাবার মৃত্যুর ঠিক পরপরই, যখন সে বুঝতে পারে তার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। আফিয়াকে গজনীতে গ্রেফতারের সময় দাবি করা হয় তার ব্যাগে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী ও রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এটাও সম্পুর্ন অসম্ভব যেখানে সেই ৫ বছর আফিয়াকে মার্কিন হেফাজতেই রাখা হয়েছিল হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আদালতে আফিয়ার বক্তব্য

৬ই জুলাই ২০০৯ সাল। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটন অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে হাজির করা হয়। এ সময় তার পায়ে ডান্ডাবেড়ি আর হাতে হাতকড়া পড়ানো ছিল। তার শরীর ও চেহারা ছিল নির্যাতনের কারণে রক্তাক্ত। তিনি যখন তার হাতকড়া পড়ানো হাত উপরে তুললেন তখন তার হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। আদালতে হাজির করার আগে তাকে নগ্ন করে পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে এবং পুনরায় পোশাক ফেরত পাওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যা অস্বীকার করার ফলে তাকে লাথি ঘুসি ও বন্দুকের বাট দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। ড. আফিয়া সিদ্দিকী ভরা আদালতে বিচারককে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমি পাগল নই। আমি একজন মুসলিম নারী। আমাকে পুরুষ সৈন্যরা জোর জবরদস্তিমূলক উলঙ্গ করে নির্যাতনের নিশানা বানিয়েছে এবং আমার পায়ের নিচে পবিত্র কুরআন ছুড়ে মেরেছে। এ সবকিছু বিচারকের (Use Of Force) শক্তি প্রয়োগের নির্দেশের ফলেই করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো সেদিনই মরে গিয়েছি যেদিন আমাকে প্রথম বার উলঙ্গ করে আমার ভিডিও বানানো হয়েছে এবং আমাকে বলা হয়, এই ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমেরিকাসহ কোনো দেশের বিরুদ্ধে নই, না আমি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরোধী। বরং আমি ইহুদিদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি আরো বলেন, আমি এই নামধারী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী এবং তার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত। কেননা আমি আফগানিস্তানেই বন্দি ছিলাম।” মাউজ সিদ্দিকীর বর্ণনা অনুযায়ী ড. আফিয়া সিদ্দিকী সে সময় অত্যন্ত কাহিল ও দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। তাকে পুরুষ কর্মকর্তারা তাদের ঘেরাওয়ের মাঝে রেখেছিল।

আফিয়ার সমর্থকদের যুক্তি

আফিয়ার পরিবার এবং তার সমর্থকেরা বিশ্বাস করেন যে, ড. আফিয়া নির্দোষ৷ তাকে টাকার জন্য অথবা অজ্ঞাত মাধ্যম থেকে আসা মিথ্যা কিংবা ভুল অভিযোগে অপহরণ করা হয়েছে৷ তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, তাকে রক্ষার জন্য বা তার কারাবাসের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসমস্ত তথ্যাবলি প্রয়োজন সেসব পাকিস্তান এবং মার্কিন দুই দেশের সরকারের ও গোয়েন্দা সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়৷ আফিয়ার বিরুদ্ধে আনা তথ্যপ্রমাণ সমূহ হয় মিথ্যা অথবা তার সন্তানদের ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে আদায় করা হয়েছে৷ তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, আফগান পুলিশ আফিয়া এবং তার ছেলেকে গজনীতে গ্রেফতার হওয়ার দিন খুঁজছিল কোনো এক অজানা মাধ্যম থেকে আসা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে৷ সমর্থকেরা এটাও দাবি করেন, যদি আফিয়া এবং তার ছেলেকে সত্যিই কেউ দেখে থাকতো, তাহলে পাকিস্তানের হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন জানিয়ে করা পিটিশান পাঠানোর সময়ই তার বিরোধীরা এই ঘটনার একটি সুবিধাজনক সমাধান করে ফেলতে পারত৷ খেয়াল করুন, আদালতকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশাররফ এবং সরকারকে (তাদের সাথে কাজ করা যে কেউই হতে পারে) এই নির্দেশ দিতে বলা হয়েছিল যেন তারা আফিয়াকে মুক্তি দেয় অথবা অন্তত তার অবস্থান সম্পর্কে জানায়৷ সমর্থকরা এমনও সন্দেহ করেন, আফিয়া গজনীর স্থানীয় ভাষা জানেন না৷ তাই তাকে নিশ্চয়ই কারো পরিকল্পনা মাফিক এমনভাবে পোশাক পরানো হয়েছিল, যেন তাকে দেখেই আত্মঘাতী হামলাকারী বলে মনে হয়৷ নিউইয়র্কে বিচার চলাকালে যে সমস্ত ফরেনসিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তাতে প্রমাণ হয় আফিয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য নয়৷ এমন অপরাধের সাথে তিনি জড়াতে পারেন না৷ তবুও সেসব যুক্তিপ্রমাণ আমলে না নিয়ে কোনো ভয়ে বশীভূত হয়েই হোক বা কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে হোক, বিচারকরা প্রসিকিউশানের সাথে সুর মেলায়৷

অনেকে দাবি করেন, মার্কিন কর্মকর্তারা ১৭ই জুলাই ২০০৮ ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে বাগরাম কারাগারের সিআইএ'র ডিটেনশন সেন্টার থেকে বের করে গজনীর গভর্ণরের বাংলোর সন্নিকটে ছেড়ে দেয়৷ এরপর আফগান বাহিনীকে নির্দেশ দেয় সেখানে একজন

আত্মঘাতী হামলাকারী আছে তাকে তাৎক্ষণিক গুলি করে হত্যা করুন। কিন্তু আফগান কর্মকর্তারা দুর্বল ও অসুস্থ ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে গুলি করার পরিবর্তে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। আফগান সরকার পাকিস্তান সরকারকে এই ঘটনা অবহিত করেন। যেহেতু ড. আফিয়া সিদ্দিকী পাকিস্তানি নাগরিক সুতরাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাকে সাথে সাথে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়ার। যার জন্য মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এফবিআইয়ের কর্মকর্তাদেরকে বাধ্য করে ড. আফিয়াকে হত্যা করতে। তাই ১৮ জুলাই মার্কিন কর্মকর্তারা আফগান প্রশাসনের নিষেধ সত্ত্বেও ড. আফিয়াকে গুলি করে মারাত্মক আহত করে দেয় এবং তাকে মৃত মনে করে চলে যায়। আফগান সরকারের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবার ফলে ড. আফিয়ার জীবন আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়।

পশ্চিমা ও মার্কিন মিডিয়াগুলোর প্রচারণার জবাবে সমর্থকেরা বলেন, ড. আফিয়া সিদ্দিকীর উপর যেসকল অভিযোগ আরোপ করেছে, ঐসকল অভিযোগের বিপরীতে একেবারেই ভিন্ন ধরনের অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতারণামূলক একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাঁচ বছরের নির্যাতনে দুর্বল, রুগ্ন ও অসুস্থ আফিয়া নাকি ছয় মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিতে এক মার্কিন সৈন্য থেকে M-4 রাইফেল কেড়ে নিয়েছেন এবং উক্ত রাইফেলের ট্রিগার টিপে মার্কিন সৈন্যদের উপর গুলি চালিয়েছেন। যেখানে তার গুলিতে কোনো মার্কিন সৈন্য একটু আহতও হয়নি। পুরো এই ঘটনায় বাকি পাঁচ সৈন্য তামাশা দেখছিল এবং যখন তার গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে তখন এক মার্কিন সৈন্য অনেক কাছ থেকে তাকে তার গুলির নিশানা বানিয়েছে। আসল ঘটনা হলো এই যে, মার্কিন সৈন্যরা ড. আফিয়াকে আফগান কর্মকর্তাদের হাতেই মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

কারাদণ্ড

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউএস ফেডারেল কোর্টে ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের গজনীতে একটি হত্যাচেষ্টা এবং মার্কিন কর্মচারীদের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ আনা হয়।

ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়, তিনি আফগানিস্তানের গজনীতে এক মার্কিন সৈন্যকে রাইফেল দিয়ে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছেন। ঘটনাটি ঘটে তখন, যখন তিনি তাদের জিম্মায় ছিলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কোনো মার্কিন সৈন্য সে সময় আহত হয়নি, তবে ড. আফিয়া গুলিবিদ্ধ হন এবং মাথায় তীব্রভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতে তার মস্তিষ্কও আক্রান্ত হয়। ড. আফিয়া সমস্ত অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। আইনি পর্যবেক্ষকদের মতে আফিয়ার বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রচুর ত্রুটি এবং অসঙ্গতি আছে। যার মাঝে সবচেয়ে বড় হলো বিচারকদের রায় নিয়ে। যেগুলোর বেশিরভাগই পক্ষপাতমূলকভাবে রাষ্ট্রপক্ষের স্বপক্ষে, আসামীর বিরুদ্ধে গিয়েছে। এ সময় আদালত প্রচুর দুর্বল প্রমাণাদি এবং জুরিদের আদেশ আমলে নেয়, যেগুলো রাষ্ট্রপক্ষের অনুকূলে যায়। এ ছাড়া আফিয়া নিজের পছন্দমাফিক উকিল নিয়োগ দিতে পারেনি। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তাকে প্রচুর কটাক্ষ সহ্য করতে হয়, যদিও এমন কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ছিল না। ফলে বিচারক রিচার্ড বারম্যানের রায়ে আফিয়া দোষী সাব্যস্ত হন, যদিও সমস্ত বাহ্যিক এবং আদালত সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি দ্বারা বোঝা যায় যে আফিয়া এমন কোনো অপরাধ করেনি।

২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিচারক রিচার্ড বারম্যান আফিয়াকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেন। আফিয়ার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র সাজিয়েছে, আইনজীবীদের এমন ধারণাকে তিনি বাতিল করে দেন। বিচারক আরও কিছু বিষয় বাড়িয়ে দেন, যেগুলো না ছিল অভিযোগনামায়, আর না ছিল দণ্ডাদেশের অন্তর্ভুক্ত। রায়ের পর আফিয়া জনগণকে প্রতিশোধপরায়ণ হতে নিষেধ করেন। আবেগপ্রবণ হতে বারণ করেন। তিনি তার প্রতি অন্যায়কারীদের ক্ষমা করে দিতে বলেন, যেমন তিনি বিচারক বারম্যানকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

স্বাক্ষীদের বর্ণনার আলোকেও এ কথা সুস্পষ্ট ছিল, ড. আফিয়া নিরপরাধ এবং মিডিয়াতে প্রকাশিত বিশ্লেষণও এটাই প্রমাণ করছিল যে, জুরিবোর্ড ড. আফিয়াকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে দেবে৷ কারন ঘটনাস্থলের উপর এমন স্বাক্ষী পাওয়া যায়নি যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ড. আফিয়া সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেছে৷ M-4 রাইফেলের উপর ড. আফিয়ার ফিঙ্গার প্রিন্ট ছিল না এবং না কোনো সাধারণ নারী কিংবা পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব, যে এই রাইফেলের নাম্বারিং সিষ্টেমের গোপন লক খুলবে৷ কেননা এই গোপন লক শুধুমাত্র রাইফেলের মালিকেরই জানা থাকে৷ যদি আফিয়া সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেও থাকে এবং তা সৈন্যদের গায়ে লাগেনি৷ তাহলে কমপক্ষে দেওয়ালের মধ্যে অবশ্যই গুলির দাগ থাকবে কিংবা জানালার পর্দার মধ্যে হলেও তো দাগ থাকার কথা৷ সাথে নিক্ষিপ্ত গুলির খোসাও থাকার কথা৷ কিন্তু তদন্তে গুলির খোসা কিংবা সেই কক্ষের কোথাও গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়নি৷

জুরিবোর্ডের এই হাস্যকর রায়ের সমালোচনা করে মার্কিন এর্টনি টিনা ফস্টার বলেন, এই রায়ের দ্বারা মার্কিনী বিচার ব্যবস্থার অপরিপক্কতা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে৷ ব্রিটিশ হাউস অফ লর্ড ড. আফিয়ার সাথে এই নিপীড়নকে মার্কিনী বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসের মূল কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন৷

আফিয়ার সন্তানেরা

১৯৯৬ সালে জন্ম নেওয়া আফিয়ার বড় ছেলে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আহমেদকে আফগানিস্তানের গজনী থেকে উদ্ধার করা হয়৷ সবাই ভেবেছিল সে কোনো এতিম হতে পারে৷ ২০০৮ সালের শেষ দিকে সে পাকিস্তানের করাচিতে তার খালার সাথে পুনর্মিলিত হয়৷ পরবর্তীতে সে একটি বিবৃতিতে জানায়,

“তারিখ মনে নেই তবে এটা অনেক দিন আগের কথা৷ আমার স্মরণ আছে আমরা ইসলামাবাদ যাচ্ছিলাম৷ রাস্তায় একটি বড় গাড়ি আমাদের গাড়ির পথরোধ করে৷ কয়েকজন এসে গাড়ির দরজা খুলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলো৷ আমি এবং আমার মা চিৎকার করে উঠলাম৷ আমি দেখলাম আমার ছোট ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় নিচে পড়ে

আছে৷ মা চিৎকার করে কান্না করছিল৷ এরপর তারা কিছু একটা দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেললো৷ আমি একটা গন্ধ পেলাম এরপর আর কিছু মনে নেই৷ যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন নিজেকে একটি রুমের ভিতরে দেখি৷ সেখানে কয়েকজন সাধারন পোশাক পড়া এবং আমেরিকান কিছু সৈন্য ছিল৷ তারা আমাকে ভিন্ন যায়গায় নিয়ে গেলো৷ যদি আমি কান্না করতাম বা কথা না শুনতাম তবে আমাকে বেঁধে রাখত এবং অনেক মারধর করতো৷ তারা ইংরেজী, উর্দু ও পশতু ভাষায় কথা বলতো৷ তারা কে ছিল এটা জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি আমার৷ দীর্ঘদিনের জন্য আমাকে একটি ছোট রুমে রাখা হয়েছিল৷ এরপর আমাকে একটি বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আমার মতো আরো অনেক শিশু ছিল৷

কাবুল জেলখানায় থাকাবস্থায় আমার কাছে আমেরিকার কনস্যুলার এসে বলল ‘তোমার নাম আহমেদ৷ তুমি আমেরিকান৷ তোমার মায়ের নাম আফিয়া সিদ্দিকী৷ তোমার ছোট ভাই সুলাইমান মারা গেছে’। এরপর তারা আমাকে নিয়ে গেলো এবং পাকিস্তানি কনস্যুলারের সাথে সাক্ষাত করালো৷ এরপর আমি আমার আন্টি ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকীর সাথে কথা বললাম৷”

ড. আফিয়ার কন্যা মারিয়াম৷ সেও জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক৷ শুনানির প্রাক্কালে আদালত কক্ষে ড. আফিয়া বেশ কয়েক বার মারিয়ামের কথা উল্লেখ করেছেন৷ যার মাধ্যমে ড. আফিয়াকে পুরোপুরিভাবে ব্ল্যাকমেইল করা হতো যেনো আদালত কক্ষে মার্কিন নির্যাতনের কথা উল্লেখ না করে৷ যখন আদালত কক্ষে তিনি মারিয়ামের কথা উল্লেখ করতেন তখন মার্কিন কর্মকর্তারা তাকে জোর পূর্বক নির্যাতনের নিশানা বানিয়ে আদালত সংলগ্ন অন্য কক্ষে নিয়ে যেতেন৷ ড. আফিয়ার কন্যার যেহেতু মার্কিন নাগরিকত্ব রয়েছে তাই তার ব্যাপারে আইন ভিন্ন এবং মারিয়ামের নিখোঁজ হওয়া মার্কিনী বিচার ব্যবস্থার জন্যও একটি বড় প্রশ্ন ছিল৷ যখন ড. আফিয়াকে জুরিবোর্ডের পক্ষপাতমূলক রায়ের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তখন মার্কিন এর্টনির পরামর্শ অনুযায়ী আফিয়ার পরিবার মারিয়ামের ব্যাপারে মার্কিন আদালতে মামলা দায়েরের

সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে ড. আফিয়াকে শাস্তি দিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। এজন্য মার্কিন এফবিআই হুসাইন হক্কানিকে এই টার্গেট দিয়ে পাকিস্তান পাঠিয়েছিল যে, ড. আফিয়ার পরিবারকে মারিয়ামের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করে আফিয়াকে ফেরত নেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে ফিরিয়ে রাখতে।

ড. আফিয়ার পরিবারের কথা ছিল, মারিয়াম যে বাগরাম কারাগারে বন্দি তাকে রাষ্ট্রীয় নিয়মানুযায়ী ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ২০১০ সালের এপ্রিলে এফবিআই পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে ড. আফিয়ার কন্যা মারিয়ামকে গোপনে করাচির গুলশান ইকবালের ৭ নাম্বার ব্লকে অবস্থিত তাদের বাসার সন্নিকটে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। সে সময় রহস্যজনক কয়েকটি গাড়ি মারিয়ামকে নজরদারি করছিল। যতক্ষণ না মারিয়াম বাসার বাহিরে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের নিকট না পৌঁছে। মারিয়ামের গলায় একটা চিরকুট ছিল যেটাতে লেখা সে ড. আফিয়ার কন্যা মারিয়াম। পুলিশ কর্মকর্তারা ড. আফিয়ার মা ইসমাত সিদ্দিকীকে খবর দিলেন এবং তারপর আফিয়ার পরিবার প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকতাদেরকে অবহিত করে। তার এক সাপ্তাহ পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে, ডিএনএ টেষ্টের রিপোর্ট অনুযায়ী এই শিশু ড. আফিয়ার কন্যা মারিয়াম। মারিয়াম অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত ছিল এবং শুধু মার্কিন ঢংয়ে ইংলিশ বলতে পারতো। আর সেই ইংলিশেই বলেছিল, ‘তাকে আংকেল জান এখানে পাঠিয়েছে’।

ড. আফিয়ার কনিষ্ঠ সন্তান সুলাইমান। ২০০৩ সালে অপহরণের সময় তার বয়স ছিল ছয় মাস। এখন পর্যন্ত সুলাইমানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান কিংবা আমেরিকান সরকার এ ব্যাপারে কিছু স্বীকার করে না। ধারণা করা হচ্ছে সে আর বেঁচে নেই।

বর্তমান অবস্থা

আফিয়া সিদ্দিকী বর্তমানে টেক্সাসের কার্সওয়েল, ফোর্ট ওর্থের ফেডারেল মেডিকেল সেন্টারে (FMC) আটক আছেন৷ সেখানে তাকে স্পেশাল হাউজিং ইউনিটে (SHU) রাখা হয়েছে, যা কিনা সবচেয়ে ভয়াবহ নির্জনবাস বিভাগ৷ কয়েদি নাম্বার ৯০২৭৯-০৫৪৷ আফিয়ার মুক্তির তারিখ ১৬/১০/২০৮৩৷ মুক্তি পেতে পেতে আফিয়ার বয়স হয়ে যাবে ১১১ বছর! এখনো তাকে বিশ্বস্ত কারো সাথে, এমনকি তার পরিবারের সাথেও ঠিকমতো যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না৷

পরিবার এবং সমর্থকরা কী চায়?

ড. আফিয়া MIT এবং ব্র্যান্ডিস থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহনকারী একজন নারী৷ বর্তমানে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া একজন৷ নিজের অতীত জীবনের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তার৷ এই অবস্থায় তার পরিবার এবং সমর্থকেরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বারবার তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছেন৷ একটি স্বাধীন এবং গুরুত্ব দিয়ে করা তদন্ত হওয়া উচিত বিগত বছরগুলোতে আফিয়ার সাথে কী কী করা হয়েছে তা নিয়ে৷ তার নিখোঁজ সন্তানেরও অবস্থান নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন৷ যেন আর কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির ভাগ্যে এমন পরিণতি না জোটে৷ ভালো মানুষ এবং ন্যায়বিচারের ওপর এখনও আফিয়ার পরিবার ও সমর্থকদের ভরসা আছে৷ আফিয়া বিগত দিনে যে অকল্পনীয় দুর্ভোগ সহ্য করেছেন তার সঠিক বিচার চান তারা৷ এ সবই তারা চান ভবিষ্যতের জন্য৷ অতীতের ভুলগুলো শোধরানোর জন্য৷ যদি আফিয়া তার পরিবারের কাছে ফিরে আসেন, হয়তো জীবনের কিছু মধুময় সময় আবারও উপভোগ করতে পারবেন তিনি, এমন আশা নিয়েই অপেক্ষা করে আছেন তার পরিবার ও সমর্থকেরা৷

ইসমাত সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার

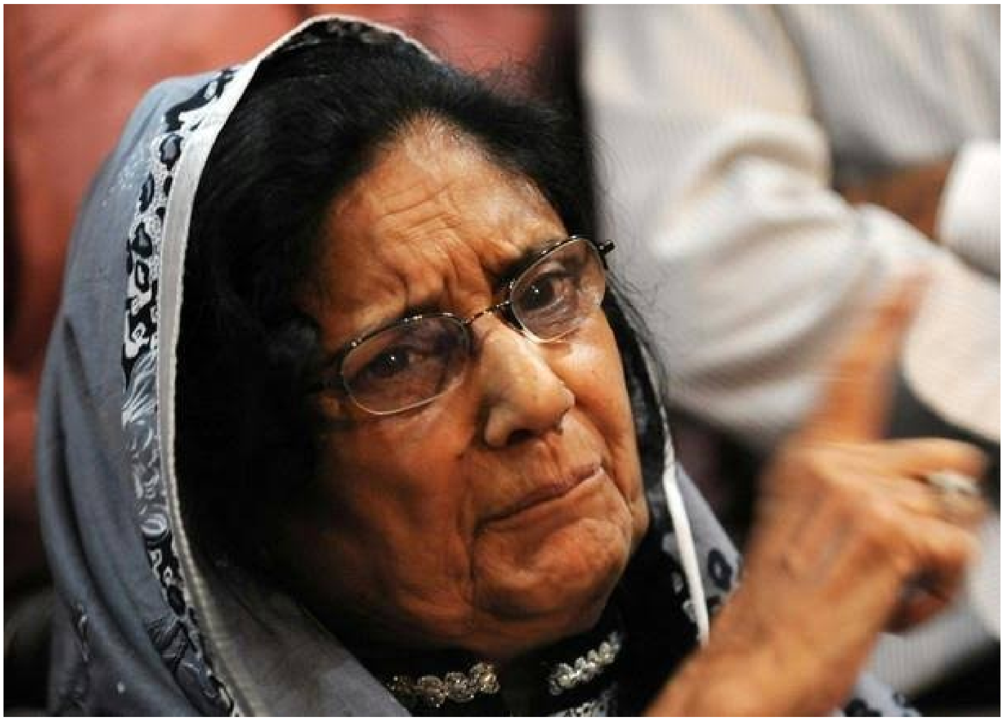

প্রশ্ন: আপনার অতীত সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

ইসমাত সিদ্দিকী: আমার নাম ছিল ইসমাত জাহান। মাত্র ৬ মাস বয়সে বাবাকে হারাই। এরপর মা আর নানার কাছে বড় হই। বিয়ের পর আমি হয়ে গেলাম ইসমাত সিদ্দিকী। বাবার দিক থেকে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা) এর সরাসরি বংশধর। আর উপমহাদেশের বিখ্যাত আউলিয়া সালিমুদ্দীন চিশতী ছিলেন আমার বড় আব্বার দাদা। বড় আব্বা মানে দাদার বাবা, অর্থাৎ প্রপিতামহ বোঝাচ্ছি। তো তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন মুঘল সম্রাট আকবরের জন্য দু'আ করে। তার কারণেই আকবর নিজের ছেলের নাম রাখেন সালিম। এই সালিম তার বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার (আদল-ই-জাহাঙ্গীরি) এর জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত। তাই তাকে ডাকা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীর নামে। সালিমুদ্দীন চিশতির মাজার আছে ভারতের ফাতেপুর সিক্রিতে। তার মৃত্যুর পর এটি

নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর৷ আমার বড় আব্বার নাম ছিল মুনাওয়ার হুসাইন ফারুকী৷ তিনি মুনাওয়ারপুরের ‘ওয়াজির’ ছিলেন৷ ভারতের অঞ্চলটির এই নামকরণ হয়েছে তার নামেই৷ এই শহরেই মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য সে সময়কার চল্লিশ হাজার রুপিতে এক খণ্ড জমি বিক্রি হয়েছিল৷ উক্ত দু’জনের সাথেও আবার আমরা পারিবারিক ভাবে সম্পর্কযুক্ত৷

আমার দাদা শুধু একজন জমিদারই ছিলেন না, ছিলেন দিল্লীর দরবারের একজন বিখ্যাত আইনজীবীও৷ তাকে বলা হতো অবিভক্ত ভারতের এটর্নি জেনারেল৷ কিন্তু তিনি সব ছেড়ে দিয়ে খিলাফত আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তার জীবন আর সম্পদ উৎসর্গ করেন৷ শিক্ষা আর আত্মত্যাগ তার রক্তে মিশে ছিল৷ আমার বাবাও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন৷ ছিলেন ধর্মীয় ‘দাস্তার’৷ কিন্তু ভাগ্য তাকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গেছে যখন তিনি কলেরার সেই মহামারির সময় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন৷ যেমনটা বলছিলাম, আমি নানার বাড়িতে মার কাছে বড় হচ্ছিলাম৷ মায়ের মতো এত নরম মনের ধৈর্য্যশীল আর দয়ালু নারী আমি আমার জীবনে দেখিনি৷ বিশাল ছিল তার জ্ঞান, চমৎকার ছিল তার বুদ্ধিমত্তা৷ সমস্ত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি আমার পড়াশোনা চালিয়ে নিয়েছেন৷ মনে আছে, আমার প্রথম বক্তৃতা তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন৷ যার বিষয় ছিল, “অসির চেয়ে মসি বড়৷” গর্বের সাথে বলছি, আমি প্রথম হয়েছিলাম সে প্রতিযোগিতায়৷ নানা ছিলেন একজন জমিদার আর নানী ছিলেন ভারতের উদয়পুর ইউপির ওয়াজিরের মেয়ে৷ সুতরাং বুঝতেই পারছেন শৈশব কি পরিমাণ প্রাচুর্য আর আয়েশের মাধ্যমে কাটিয়েছি৷

প্রশ্ন: আপনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা বলছিলেন৷ সেক্ষেত্রে আপনার পরিবারের কিছু অবদানের কথা উল্লেখ করতে পারবেন?

ইসমাত সিদ্দিকী: হ্যাঁ, স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে আমার পরিবার অনেক অবদান রেখেছে৷ দাদা তার সমস্ত অর্জন, সম্পদ সব কিছুই এর পেছনে ব্যয় করেছিলেন৷ স্বাধীনতা সংগ্রামে আলীগড় আন্দোলনের ভূমিকার ব্যাপারে ইতিহাস নিজেই সাক্ষী হয়ে আছে৷ আমার স্বামী আলীগড় আন্দোলনের সময় অনেককিছু হারিয়েছেন৷ তার পরিবারের বহু সদস্য এ সময় শহীদ হয়েছেন৷ আমি তখন খুব ছোট, তবুও শুনেছি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ কায়েদে আযমকে বিনাশর্তে দান করা হয়েছে৷ মনে পড়ে, দাদীকে দেখেছি তিনি মহিলাদেরকে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন৷ তিনি মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থাও করেছিলেন৷

প্রশ্ন: ধন্যবাদ৷ এবার আমাদেরকে আফিয়ার ছোটবেলা নিয়ে কিছু বলুন৷

ইসমাত সিদ্দিকী: ছোটবেলা থেকেই আফিয়া খুবই অমায়িক৷ তার পছন্দের যে কোনো কিছু সে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিত৷ সংবেদনশীল ছিল ভীষণ৷ কারো কষ্ট দেখলে যেন সেই কষ্টটা সে নিজেও পাচ্ছে, এমন ছিল আমার মেয়েটা৷ একটা ঘটনা বলি, একবার আমার আঙুল কেটে গিয়েছিল৷ আফিয়া তা দেখে কান্না করে দেয়৷ নিজের আঙুল চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, “আম্মু তোমার তো খুব ব্যথা লাগছে৷”

স্কুলে বা বাসায়, সব সময় বড়দেরকে শ্রদ্ধা করত৷ আর ওর বাবার কাছে আফিয়া ছিল একেবারে প্রাণের ময়না পাখি৷ আফিয়ার আশপাশের সবার মাঝে ওর হাসি, ওর ভালোবাসা সংক্রামকের মতো ছড়িয়ে পড়তো৷ কাজের লোকেরা কখনো কোনো কাঁচের জিনিস ভেঙে ফেললে আফিয়া নিজের গায়ে দোষটা নিয়ে নিত, যেন কাজের লোকগুলো বকাঝকা না খায়৷ বেলুন, পুতুল এগুলো নিয়ে খেলতে পছন্দ করত৷ আর বই, খুব ভালোবাসত বই পড়তে৷ যত বড় হতে লাগল, দেখা গেল এখন পুতুল ছেড়ে ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলে৷ আস্তে আস্তে মানবসেবায় তার আগ্রহ বাড়তে লাগল৷ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে জড়িয়ে পড়ল৷

তা ছাড়া কুরআনের প্রতি তার টান ছিল অন্যরকম। নিজ প্রচেষ্টায় অর্থ, ব্যাখ্যাসহ কুরআন শিখেছিল। একইভাবে বাইবেল আর তোরাহ (খ্রিষ্টীয়ধর্মগ্রন্থ)ও পড়ছিল। আমার আরেক মেয়ে ফাওজিয়া তো ওকে ডাকত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এনসাইক্লোপিডিয়া বলে। ঈদের আগের রাতে চুড়ি, মেহেদী, খেলনা সহ আরও নানান জিনিস কিনে এনে গরীব বাচ্চাদের গিফট করত। এসব কথা আমার আফিয়া কখনোই বলে বেড়াত না। না, আমার মেয়ে খুবই লাজুক ছিল।

প্রশ্ন: আফিয়ার কোনো দু'টি জিনিসের কথা আপনার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে?

ইসমাত সিদ্দিকী: দেখুন, আমি আফিয়ার মা। মিস করলে ওকে আর ওর সবকিছুকেই মিস করব। তারপরও আলাদা করে বললে, সকালবেলা ওর কুরআন তিলাওয়াত আর সারা ঘরে গুনগুন করাটাই মনে পড়ে বেশি। আর বলব রাতের বেলা ও আমার পা মালিশ করতে করতে গুটুর গুটুর করে গল্প করত। স্কুলে কী কী করল এসব বলত...

প্রশ্ন: পাকিস্তানের মায়েরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে আপনার ধৈর্য আর অবিচল বিশ্বাসের জন্য। আমাদেরকে বলবেন এই শক্তি কোথায় পান আপনি?

ইসমাত সিদ্দিকী: কুরআন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কুরআনই আমাকে সান্ত্বনা যোগায়। আমার সব সমস্যার সমাধান আমি এখানেই খুঁজে পাই। আরেকটা ব্যাপার, নিরাশ হওয়া ইসলাম সম্মত নয়। কেন আমি অভিযোগ করব যেখানে আমি পাকিস্তানে আমার পরিবার আর বন্ধুদের মাঝে আছি, অথচ আমার মাসুম বাচ্চাটা বিদেশে কারাগারের অন্ধকারে একা সব অত্যাচারের পরও আল্লাহ আর তার রাসূল صلى الله عليه وسلم এর প্রশংসা করে যাচ্ছে? আসলে এসব কঠিন মুহূর্ত আর পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর

আরও অনেক কাছাকাছি চলে আসি। এসব আমাকে একটি কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়,

“রাজ্য জয়ের স্বপ্ন কিংবা ক্ষুধায় মরার ভয়
সবই ফিকে তাহাজ্জুদে যদি কান্না নসিব হয়।“

আর আমি জানি, সারা বিশ্বে হাজার হাজার মানুষ আছেন যারা আমাদের জন্য দু’আ করছেন। সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আফিয়ার মুক্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। যখন এত এত লোক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে একত্র হয়, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্য দান করেন। তাদের সবাইকে আমি স্যালুট জানাই, তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করি।

প্রশ্ন: আফিয়া যদি গ্রেফতার না হতেন, তাকে আপনি কোনো পর্যায়ে দেখতেন বলে মনে করেন?

ইসমাত সিদ্দিকী: আগেই বলেছি আফিয়া খুবই সেন্সিটিভ স্বভাবের। সে ছোটবেলা থেকেই মানুষের কষ্টকে নিজের কষ্ট হিসেবে দেখে অভ্যস্ত। পড়াশোনার পাশাপাশি সে সবসময় মানবসেবা করেছে। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে বৃদ্ধাশ্রমে, শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে। সেটা পাকিস্তানে এবং আমেরিকাতে গিয়েও।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন দেখত। এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চেয়েছিল যেটা পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে আমাদের ব্যবধান ঘোচাবে। যেখানে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তেমন দ্বন্দ্ব থাকবে না। বিশ্বাস করত দেশের মানুষকে ঠিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই বর্তমান সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। যদি তার দশ বছরের শিক্ষানীতি আমরা প্রয়োগ করতে পারতাম, আমাদের দেশের আজকে এই দুর্দশা হতো না। অর্থনৈতিক ভাবে এতটা ভেঙে পড়ত না আমাদের দেশ।

প্রশ্ন: যখন এত মানুষকে আফিয়ার প্রতি সমর্থন জানাতে দেখেন, তখন কেমন অনুভব হয়?

ইসমাত সিদ্দিকী: সবার এই অকুণ্ঠ ভালোবাসায় উৎফুল্ল হই, সত্যি। একই সাথে এসব আমাকে আফিয়ার কথা বেশি বেশি মনে করিয়ে দেয়। খুব মিস করি ওকে তখন। মনটা ভরে যায় একথা ভেবে যে, আল্লাহ কতখানি সন্তুষ্ট আমার মেয়েটার ওপর! তার এই দুর্ভোগের সময় আল্লাহ নাম না জানা কত শত ছেলেমেয়েকে আমার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছেন, যাদেরকে আমি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসি। নিজেকে ভাগ্যবতী, সম্মানিত মনে করি আমি। দেশ বিদেশের অসংখ্য মানুষ আমার মানবতার প্রতি বিশ্বাসকে চাঙ্গা করেছেন। আল্লাহ আপনাদের সার্বিক মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন: মাউরি সালাখান নামের একজন আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী আফিয়ার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। তার এই সফরকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

ইসমাত সিদ্দিকী: মাউরি সালাখান একজন মহান মানুষ। আফিয়ার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ায় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং সামনে থেকে সবকিছু দেখেছেন। তিনি ন্যায়বিচারের পক্ষে তার প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তার “আফিয়া সিদ্দিকী: আদার ভয়সেস” নামক বইতে আফিয়াকে নিয়ে হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধগুচ্ছ স্থান পেয়েছে। তিনি আমাকে যা যা লিখেছেন সেসব পড়ে শোনাচ্ছিলেন। বলছিলেন তার অনুভূতির কথা। সেসব শুনছিলাম আর তীব্রভাবে আফিয়ার অভাব বোধ করছিলাম। একই সাথে গর্ববোধ করছিলাম এই ভেবে যে, আল্লাহ আমার মেয়েকে দিয়ে ওলী-দের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। খুব সামান্য কষ্টও পেয়েছি এই ভেবে- একটা মানুষ আমেরিকা থেকে পাকিস্তান চলে এসেছে এদেশের জনগণকে বোঝাতে যে তাদের দেশের সন্তান কত অসাধারণ এক নারী। অথচ আমাদের দেশের নেতারাই সেটা বুঝল না! তারা যদি একটিবার বুঝত

আফিয়া যেনতেন কেউ নয়! সে এমন একজন যাকে আল্লাহ বিশেষ কিছু করার জন্য বেছে নিয়েছেন। মাউরি সালাখানের চোখ ভিজে গিয়েছিল যখন তিনি আমাকে বলছিলেন, "আপনি বিশ্বাস করবেন না কত মানুষ আফিয়ার এই বন্দি হওয়ার ঘটনা থেকে উজ্জীবিত হয়েছে!" আফিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তিনি অত্যন্ত লজ্জিত যে, তার দেশের সরকার সমস্ত প্রমাণাদি উপেক্ষা করে এমন অবিচার করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: নওয়াজ শরীফের মেয়ে মারিয়াম, আফিয়ার মেয়ের নামও তা-ই। তাদের ভাগ্যেও কোনো মিল খুঁজে পান?

ইসমাত সিদ্দিকী: যখন নওয়াজ শরীফ জেলে গেলেন, তার মেয়েও নিজের বাবার জন্য এতটা প্রার্থনা করেনি যতটা আফিয়া করেছে। এখন আফিয়ার মেয়ে মারিয়াম তার কাছে গিয়ে অনুনয় করে বলেছে, নওয়াজ আঙ্কেল, প্লিজ আমার আম্মুকে ফিরিয়ে আনুন। মারিয়াম নওয়াজ তরুণদের প্রতিনিধি হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে-ও এ ব্যাপারে কিছু বলছে না। নওয়াজ শরীফের মুক্তির জন্য আফিয়া সম্ভাব্য সবকিছুই করেছিল। অথচ আমার আফিয়ার জন্য তিনি কিছুই করছেন না।

প্রশ্ন: আফিয়ার ব্যাপারে এমন কিছু কি আমাদের বলবেন, যা আগে কখনো বলেননি?

ইসমাত সিদ্দিকী: আফিয়া পূর্ব এবং পশ্চিমের চমৎকার সম্মিলন। ধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্যের পাশাপাশি সে ছিল অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। মাঝ রাতে সে দেশ আর সমস্ত নেতার জন্য দু'আ করত। সে আমেরিকার বৃদ্ধদের পেছনে সময় ব্যয় করত, দেশে থাকতেও তার এই অভ্যাস ছিল। সে বলত আমেরিকার প্রতি সে দায় বোধ করে, যেহেতু ঐ দেশটিই তার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিত্যনতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিল। সে চাইতো তার

আধ্যাত্মিকতা আর কুরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে। বিশ্বাস করত এদের সম্মিলিত শিক্ষাই আমাদের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।

একদিন বাইরে খুব বৃষ্টি। ঠাণ্ডাও পড়েছিল অনেক। এক বৃদ্ধা রাস্তা পার হচ্ছিল। মহিলার এক হাতে ছাতা, আরেক হাতে বাজারের ব্যাগ। আফিয়া গাড়ি থামিয়ে তাকে উঠতে বলল। বৃদ্ধাকে গা মুছতে দিল এবং তার বাজারসদাই শেষ করাল গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে। সবশেষে তাকে বড়ি পৌঁছে দিল। বৃদ্ধা নামার পর আমাদেরকে মুখে ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু সে চোখে এমন কিছু নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল, কোনো ভাষা সেই কৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করার যোগ্যতা রাখে না।

প্রশ্ন: আফিয়ার বিরুদ্ধে দেওয়া ৮৬ বছরের কারাদণ্ডের ব্যাপারে কিছু বলবেন দয়া করে?

ইসমাত সিদ্দিকী: আমার মেয়ের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে দেওয়া যে কোনো রায়ই হবে অবিচার। শুধু আমরা না, আমেরিকার আদালতও জানে আফিয়াকে এমন অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে যা সে করেনি। আমেরিকার জনগণ, যারা আফিয়ার রায় শুনেছে তারাও ন্যায়বিচারের লঙ্ঘনে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই আমার নিরপরাধ মেয়ের বন্দি অবস্থায় কাটানো প্রতিটা মুহূর্তই তার ওপর ভীষণ অবিচার। আমেরিকা দাবি করে তারা মানবাধিকারের বেলায় চ্যাম্পিয়ন। তাদের এই দাবি যদি বিন্দুমাত্র সত্য হয় তাহলে তারা আফিয়াকে মুক্তি দিক। আমি দু'আ করি, যেন আল্লাহ মুসলিম শাসকদের সুবুদ্ধির উদয় ঘটান। তারা তারিক বিন যিয়াদ, মু'তাসিম বিল্লাহ, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো সাহস নিয়ে গর্জে উঠুক। আমি তাদের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে শঙ্কিত। তবু আশা করি তারা সাহসিকতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, লজ্জার নজির না।

প্রশ্ন: সবকিছু মিলিয়ে কোনো জিনিসটা আপনাকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দেয়?

ইসমাত সিদ্দিকী: আপনি জানেন আফিয়ার নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে... কিন্তু আফিয়ার মুসলিম ভাইয়েরাই ওসব অভিযোগ অন্ধভাবে বিশ্বাস করছে। শুধু তা-ই না, তারা আরও বলছে আমেরিকার মিথ্যা বলার দরকার কী? নিশ্চই সে কিছু না কিছু করেছে। যদিও সব তথ্য প্রমাণ করে আফিয়া নির্দোষ, দুষ্কৃতকারীদের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই, তবুও মিডিয়া কাদা ছুঁড়েই যাচ্ছে। মানুষও যাচাই না করে সব বিশ্বাস করে নিচ্ছে। মিডিয়ার সাথে সুর মেলাচ্ছে। কিভাবে আমাদের মুসলিমরা ভুলে গেল কুরআনের সেই আয়াতসমূহ, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "যদি কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমের নামে অপবাদ রটায়, তাহলে প্রথমে তোমরা... " না না না, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা। এ ব্যাপারে সূরা নূরে আল্লাহ দশটিরও বেশি আয়াত নাযিল করেছেন যখন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) কে জড়িয়েও লোকেরা অপবাদ রটিয়েছিল। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে সমস্ত ঈমানদারকে আদেশ দিয়েছেন, যেন তারা এমন কোনো কথা না বলে বেড়ায় যা কিনা একজন মুসলিমের জন্য অপমানজনক। আমরা কি নিজেদের ঈমান খুইয়ে ফেলেছি? আমরা কি চাই আমাদের সমস্ত আমল আমাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হোক? এই ভাবনাটাই আমাকে বেশি পীড়া দেয়। আমি আমার মুসলিম উম্মাহকে ভালোবাসি। সবার জন্য হিদায়াত আর সাহসিকতার প্রার্থনা করি।

প্রশ্ন: আফিয়ার সাথে আপনার শেষ কবে কথা হয়েছে? আমাদেরকে বলবেন সেসবের কোনো অংশ?

ইসমাত সিদ্দিকী: শেষবার যখন কথা হয়েছে, তার কণ্ঠে গভীর বিষাদের ছায়া ছিল। যদিও সে চেষ্টা করছিল নিজের সাহস ধরে রেখে কথা বলতে, কিন্তু আমি তো মা। আমি ঠিকই টের পেয়েছি তার বেদনার গভীরতা। সে ঈমানের কথা বলছিল। বলছিল কিভাবে

মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে সান্ত্বনা জানান। আর, আফিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, “একজনও কি সত্যিকারের মুসলিম নেতা বেঁচে নেই?”

প্রশ্ন: আফিয়ার দুই সন্তান আহমেদ, মারিয়াম। ওরা কেমন আছে?

ইসমাত সিদ্দিকী: আলহামদুলিল্লাহ, ওরা ভালো আছে। স্কুলে যাচ্ছে নিয়মিত। তারা যেভাবে আমাদের কাছে এল, যেভাবে সবকিছু সামলে উঠল এবং পড়াশোনায় যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এ সবকিছুই খুবই অলৌকিক ব্যাপার। মানুষের সক্ষমতার এটাও একটা নিদর্শন।

প্রশ্ন: ড. ফাওজিয়া আমাদের বলছিলেন যে, মারিয়াম ঠিক ড. আফিয়ার অনুরূপ হয়েছে। আপনি কী মনে করেন?

ইসমাত সিদ্দিকী: মাশাআল্লাহ মারিয়ামের অনেককিছুতেই আফিয়ার সাদৃশ্য আছে। আমি তাকে মাঝেমাঝে আফিয়া বলেই ডাকি। সেও তার মায়ের মতো বুদ্ধিমতী এবং মেধাবী। কিন্তু আফিয়ার চেয়ে একটু বেশিই স্বল্পভাষী, গম্ভীর। প্রায়ই চিন্তা করি, এসব অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাওয়া না লাগলে আমার নাতনীটা না জানি কত কী হতে পারত। তারপর সান্ত্বনা পাই এই ভেবে, আগুনে পুড়িয়েই তো খাঁটি সোনা গড়ে তোলা হয়।

প্রশ্ন: আপনার জীবন থেকে আমাদের পাঠকদের জন্য কোনো বার্তা দিতে চান?

ইসমাত সিদ্দিকী: জীবন থেকে আমি দুইটি জিনিস শিখেছি। এক, আপনার মা-কে যত্নের সাথে আগলে রাখুন। কারণ মায়ের ভালোবাসাটা এমন একটা কিছু, যা আল্লাহ

তার নিজের ভালোবাসার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। মা বলতে শুধু আপনার জন্মদাত্রীই না, আপনার শাশুড়িও। কারণ তার সেবাতেও অনেক বড় প্রতিদান আছে। আর দুই, যত কঠিন পরিস্থিতিরি মুখোমুখি হোন না কেন, কখনো আশা হারাবেন না। কুরআন পাঠের মাধ্যমে সান্ত্বনা খুঁজুন, পেয়ে যাবেন।

আফিয়ার মায়ের এই সাক্ষাৎকারটি ২০১৪ সালে নেওয়া হয়েছিল।

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: আফিয়া সম্পর্কিত সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের জানাবেন দয়া করে।

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: ২০১৩ সালের আগস্টে নওয়াজ সরকার আমাদের বলেছিল যে, কেবিনেটে আফিয়ার ব্যাপারে আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ৯০ দিনের মধ্যে আফিয়া পাকিস্তানে ফিরে আসবে৷ অথচ ১৮০ দিনের বেশি হয়ে গেল, সেরকম কোনো লক্ষণই তো দেখছি না৷ পরে ডিসেম্বরে যখন আবার তাদের কাছে গেলাম, বলল ২০১৪ এর শুরুর দিকেই আফিয়া ফিরে আসবে৷ কিন্তু এটাও আগের মতোই ‘বলার জন্য বলা’ একটা কথা ছিল৷ তাদের এমন অবহেলা আমাদের মনে সংশয়, সন্দেহের জন্ম দিয়েছে৷ মার্চ থেকে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করেছি৷ আশা করি, এর মাধ্যমে অবশ্যই আমেরিকা এবং ইসলামাবাদ উভয় পক্ষের ওপরই চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ৷

প্রশ্ন: মার্চ মাসেই এ আন্দোলনটি করার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: মার্চ মাসে আফিয়ার জন্ম৷ মার্চ মাসেই আফিয়াকে ‘পাকিস্তানের গর্ব’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়৷ আর, দুঃখজনকভাবে তার অপহরণের ঘটনাও ঘটেছিল মার্চেই৷ সবকিছু মিলিয়ে তাই আমরা এ মাসটাকে আমাদের সংগ্রামের জন্য বেছে নিয়েছি৷

প্রশ্ন: আফিয়ার জীবনের এমন কিছু দিক তুলে ধরুন যেগুলো আফিয়া সম্পর্কে জনমানুষের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে সহায়ক হবে৷

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: সবার আগে বলতে চাই, আফিয়াকে কেন আমাদের সরকারী লোকেরা আমেরিকার নাগরিক বলে, এটি আমি বুঝতে পারি না৷ একেবারেই না৷ আমার বোন একজন পাকিস্তানি এবং সে কখনোই আমেরিকার নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন

করেনি৷ সেখানে সে স্টুডেন্ট ভিসায় থাকত৷ সুতরাং তার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের জন্যই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ আর পাকিস্তানের সরকারেরই দায়িত্ব তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা৷ যেহেতু তার অপহরণের সাথে পাকিস্তান সরকার জড়িত ছিল, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করলে সরকারকেই করতে হবে৷

আরেকটি ব্যাপার লোকে বুঝতে ভুল করে তার প্রফেশনাল ডিগ্রী নিয়ে৷ সবাই তাকে ভাবে নিউরোলজিস্ট (স্নায়ুবিশেষজ্ঞ) বা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট (পরমাণু বিজ্ঞানী)৷ পরমাণু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার পারদর্শিতা ছিল, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা৷ সে পিএইচ.ডি. ধারী ছিল সত্য, কিন্তু তার গবেষণার বিষয় ছিল শিক্ষা৷ তার থিসিসের নাম ছিল “অনুকরণের মাধ্যমে শেখা৷” কষ্ট হয়, যখন দেখি যেসব মিথ্যা তার নামে ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলো শুধু আমেরিকানরাই ছড়াচ্ছে না৷ আমাদের নিজেদের দেশের আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরাও এগুলো সৃষ্টি এবং প্রচারের কাজ করছে৷ এই দেশের মেয়েদেরকে যখন বিক্রি করে দেওয়া হয়, বিদেশের কারাগারে পচে মরতে দেওয়া হয় তখন আমরা আতঙ্কিত হই- এমন পাপের ফলে জাতির ওপর আসন্ন বিপর্যয় নিয়ে৷ জাতির মর্যাদার প্রশ্নে আমাদের এহেন উদাসীনতা সত্যিই দুঃখজনক৷ আপনারা জানেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এটর্নি জেনারেল রামযি ক্লার্ক, যার বয়স এখন আশি চলছে, বলেছেন এমন জঘন্য বিচার আর কখনো দেখা যায়নি৷ তিনি মনে করেন পুরো পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের একতাই হবে এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ৷ অন্যথায় তাদের এই একটি ব্যাপারের উদাসীনতা পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপরই একদিন আঘাত হিসেবে নেমে আসতে পারে৷

প্রশ্ন: আপনি বললেন আফিয়ার পড়াশোনার বিষয় ছিল শিক্ষা৷ তো, এই দেশের শিক্ষা নিয়ে তার পরিকল্পনা কী ছিল?

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: সে এমন এক শিক্ষানীতি সাজিয়েছিল, যা বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলাধুলা আর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশুদের শেখার দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে৷ দশ

বছরের সেই শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী কেবল হাফিজে কুরআনই হবে না, একই সাথে কুরআনের বিভিন্ন দৈনন্দিন এবং বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তা করতেও তারা দক্ষ হয়ে উঠবে। এটি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, যা এগার বছর আগে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের তরুণেরা আজকের দিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আত্মবিশ্বাসী এবং সক্ষম হতে পারত। আফসোস, তার জিনিসপত্র, ডকুমেন্ট এবং কম্পিউটারের সাথে সমস্ত পরিকল্পনাও হারিয়ে গিয়েছে। বোঝাই যায়, তারা চায় না পাকিস্তানে এমন শিক্ষানীতি চালু হোক। আমাদের দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরশীল এবং উচ্চ মর্যাদা নিয়ে বেড়ে উঠবে, এটা তারা কিভাবে মেনে নেবে? তার শিক্ষানীতি হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, এমআইটি-র মতো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা পদ্ধতির মতো পদ্ধতির ইসলামী রূপ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। সে সম্পূর্ণ কুরআন অর্থ এবং তাফসীরসহ তার হৃদয়ে ধারণ করেছিল। নিঃসন্দেহে সে ছিল কুরআনের এনসাইক্লোপিডিয়া। যদি কেউ তাকে কুরআনের একটি ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞেস করত, সে কুরআনের অন্যান্য জায়গা থেকে ঐ ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করে তাদের প্রেক্ষাপট সহ ব্যাখ্যা করত। নিজের থিসিস লেখার সময়, আমেরিকাতেই সে কুরআন হিফজ করেছিল।

প্রশ্ন: আফিয়ার ছোটবেলা কেমন কেটেছে?

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: বেলুন আর পুতুল তার খুব পছন্দের জিনিস ছিল। কোনো বেলুন ফেটে গেলে সে কান্না করে দিত। কিন্তু বেলুন তো ফাটবেই। তারপরেও আফিয়া অনেক বেলুন কিনত আর ফেটে গেলে কাঁদত। আম্মা তখন ওকে বোঝাত যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং দুনিয়ার প্রতেকটা জিনিসই আজীবন টিকবে না। আর পুতুল ছিল ওর প্রাণসাথী। অনেক অনেক পুতুল ছিল ওর। সব ধরনের, সব আকারের। এমনভাবে পুতুলগুলোকে আফিয়া আদর করত যেন সেগুলো জীবন্ত কিছু ছিল। আর বড় ভাইরা তো থাকেই বোনদেরকে ক্ষেপানোর জন্য। আমাদের ভাই জানত আফিয়াকে কিভাবে রাগানো যাবে। ভাইয়া করত কী, আফিয়ার পুতুল পায়ে ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখত।

আর আফিয়াও চিৎকার করত, “ছেড়ে দাও। সোজা কর। ওর রক্ত সব মাথায় চলে আসছে।”

প্রশ্ন: ড. আফিয়ার সাথে ফোনে কথা হয় আপনার? হলে কতদিন পরপর হয়?

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যখন তাদের ইচ্ছে হয়, তখন কথা বলতে দেয়। ইচ্ছে না হলে দেয় না। যখন আন্দোলন সংগ্রাম বেশি হয়, তখন পারলে প্রতিদিনই সুযোগ করে দেয়। যেমন পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইনের সময় একমাস যাবৎ প্রতিদিনই ফোনকলের মাধ্যমে কথা বলতে দিয়েছিল। একইভাবে আফ্রিকায় আমেরিকার দূতাবাস যখন আন্দোলনকারীরা ঘেরাও করে ফেলল, তখনও প্রায়ই ফোন আসত জেলখানা থেকে। সুতরাং আমি বলব, আল্লাহর ইচ্ছার পর জনগণের চাপই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমেরিকা যখন দেখে লোকজন আফিয়াকে নিয়ে সরব, তখন ফোনকলের সুযোগ করে দেয়। জনগণ চুপ হয়ে গেলে ওরাও নীরব হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন: আপনার আন্দোলনে সাধারণরা কিভাবে আপনার সাহায্যে আসতে পারে?

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: দেখুন, যে কোনো ক্ষুদ্র ভূমিকাও অনেক বড় অবদান রাখতে পারে। ভূমিকা রাখা যেতে পারে ওয়েবসাইটে এই সম্পর্কিত কোনো লেখায় লাইক দেওয়ার বা ফেইসবুকে একটা ভালো কমেন্ট করার মাধ্যমে। লোকে ভাবে, তাদের কিছুই করার নেই। কেন? যতক্ষণ আফিয়া বেঁচে আছে ততক্ষণ তাকে মুক্ত করার আশা আছে। আসল কথা হলো, যত বেশি মানুষের অংশগ্রহণ হবে, তত চাপ সৃষ্টি হবে। কেউ যদি আর কিছুও না করতে পারে অন্তত ফোনটা হাতে নিয়ে পরিচিতদেরকে একটি মেসেজ হলেও পাঠাক যে, “এগারো বছর হয়ে গেছে, আফিয়া এখনো বিদেশীদের জেলে।” সচেতনতাটা বাড়ুক। মানুষ জানুক। এটা তো আফিয়ার একার সমস্যা না বরং

এটা দেশের সম্মানের বিষয়, আমাদের মা বোনদের নিরাপত্তার বিষয়। আপনাদের সামান্য অনুদানও আমাদের জন্য অনেক। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যথেষ্ট সম্পদ ছিল, আমরা তার মামলা চালাতে পেরেছি। কিন্তু এখন চারিদিকের চাপ এত বেড়ে গেছে যে, দেখতেই পারছেন দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা কোনো কর্মসূচি দিতে পারিনি। তা ছাড়া এখন এমন আরও অনেকেই আছে যাদেরকে আমরা নিখোঁজ বলে ধরে নিয়েছি, কিন্তু তারা একইরকম অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে যাচ্ছে।

আজ তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, কাল বা পরশু আমাদেরকেই এই পরিণতি বরণ করতে হবে। আমরা নিজেদের ভাইবোনদের নিয়েই যদি জোর গলায় আওয়াজ তুলতে না পারি, তাহলে পুরো বিশ্বের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এরই মধ্যে আমরা আমাদের সম্মান হারাতে শুরু করেছি। রেমন্ড ডেভিসের কথাই ধরুন। সে ছিল এক খুনী। কারারুদ্ধ ছিল। তবুও দেখুন আমেরিকা সরকার কিভাবে চাপ সৃষ্টি করে তাদের নাগরিককে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। ভারত সরকারও তাদের এক অপরাধী কাউন্সিলরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও সেই মহিলা আমেরিকার আইন ভঙ্গ করেছিল। যখন পুরো ভারত তার নাগরিককে উদ্ধারে ফুঁসে উঠল, আমেরিকা তাকে আর আটকে রাখতে পারল না। কিন্তু আমাদের আফিয়া?? আমার বোন সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর আমরা? আমরা আমাদের নিজেদের নাগরিককেই বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছি। যেন আমরা নিজেদের কাছেই মূল্যহীন। আজ কেন আমাদের ওপর আমেরিকার ড্রোন হামলা চালাচ্ছে? কেন আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারছে? কারণ আমরা নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে পারিনি। একবার যদি আমরা একতাবদ্ধ হতাম, কেউ এমন সাহস করত না। কেউ সাহস করতে পারত না।

প্রশ্ন : এবার আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী: আমি একজন চিকিৎসক, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। আমেরিকান বোর্ড অব নিউরোলজি এবং সাইকিয়াট্রি থেকে ডিপ্লোমা করেছি। আর প্রশিক্ষণ নিয়েছি হার্ভার্ডে। আমেরিকায় সবশেষে ছিলাম জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনাই হসপিটালে নিউরোফিজিওলজি এন্ড এপিলেপ্সি বিভাগের পরিচালক হিসেবে। আমেরিকার "আউটস্ট্যান্ডিং প্রফেশনাল এওয়ার্ড"-ও অর্জন করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ পাকিস্তানে আমিই একমাত্র বোর্ড সনদপ্রাপ্ত এপিলেপ্সি বিশেষজ্ঞ।

আফিয়ার বোনের এই সাক্ষাৎকারটি ২০১৪ সালে নেওয়া হয়েছিল।

আসলে আফিয়ার অপরাধটা কী ছিল?

আপনাদের কাছে সবকিছু পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য আমি আফিয়ার ছোটবেলা দিয়েই শুরু করতে চাই। আসলে ওর জীবনের পুরো আটত্রিশ বছর, আর আট বছরের কারাজীবনকে একসাথে সংক্ষেপে বলাটা কিছুটা অসম্ভব আমার জন্য। তবুও যতটুকু পারি চেষ্টা করব। আফিয়া কে ছিল, তার লক্ষ্য কী ছিল তা বলব। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী এবং মামলার অগ্রগতি কতটুকু তাও জানাব।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন চিকিৎসক আর মা সমাজকর্মী। আমরা তিন ভাইবোন। বড় ভাইয়া আমেরিকায় থাকেন, তারপর আমি। আমি একজন নিউরোলজিস্ট, পড়াশোনা করেছি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সবশেষে আমাদের সবার ছোট আফিয়া। আপনারা জানেন পরিবারের ছোটজন সবার ভীষণ আদরের হয়। আফিয়াও ছিল

তেমনি আমাদের চোখের মনি। শুধু ছোট হওয়ার জন্যই তাকে সবাই খুব পছন্দ করতাম এমনটা নয়। আল্লাহ ওকে অসাধারণ মেধাবী করে পাঠিয়েছেন। ক্লাসে সবসময় সে ফার্স্ট তো হতোই, অসংখ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সেগুলো থেকেও প্রচুর পুরস্কার জিতে নেয়। কোনো প্রতিযোগিতার নাম আপনি বলবেন? সবগুলোতেই সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। কোনো বিতর্ক বা রচনা প্রতিযোগিতায় সে কখনো পরাজিত হয়নি। তাই অনেক ট্রফি আর সার্টিফিকেট পেয়েছে। আমরা এখনো সেগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ইন্টারমিডিয়েটে আফিয়া ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলো। তখনই আমেরিকায় ফুল স্কলারশিপে পড়ার একটি অফার পেল সে। ভাইয়া যেহেতু আগে থেকেই ওখানে আছে, তাই বাসা থেকেও সবাই রাজী হয়ে গেল ওকে ওখানে পাঠানোর ব্যাপারে। তো যাওয়ার আগে একটি টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সেটায় সে একেবারে বিশ্বের এক নাম্বার বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাসেচুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (MIT)-তে টিকে গেল। তারপর ওখানেই ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

ছোটবেলা থেকেই তার খুব পছন্দের কিছু জিনিস ছিল। আফিয়া একবারে যখন ছোট, পুতুলের জন্য ছিল ব্যাপক টান। একটু বড় হওয়ার পর থেকে সেই আকর্ষণ সরে এল ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রতি। এ ছাড়া বয়স্কা মহিলাদের জন্যও ওর হৃদয়ে বড় একটা জায়গা ছিল। তাই আমেরিকা যাওয়ার পরও সেখানকার বৃদ্ধাদের সেবা করার পেছনে অনেক সময় দিয়েছে। আর কুরআনের জন্য ভালোবাসা ছিল সবকিছুর ওপরে। এমআইটিতে পড়ার সময়ই আফিয়া কুরআন হিফজ করে। বিশেষ করে বলতে চাই সে কিন্তু শুধু কুরআনই মুখস্থ করেনি বরং অর্থ এবং তাফসীরসহ কুরআন শিখে ফেলেছিল। কখনো কেউ কুরআনের কোনো ঘটনা বা হুকুম ওকে জিজ্ঞেস করলে আফিয়া সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত। তারপর এদের অর্থ বলে ব্যাখ্যা শোনাতো। নিজের ক্লাসের সেরা ছাত্র যেমন ছিল, আমার বোন একই সময়ে কুরআন শেখাও চালিয়ে গেছে।

ওখানে আফিয়া কুরআনের কপি এবং এর অনুবাদ বিতরণ করত। বিভিন্ন সংগঠন যেভাবে তাদের মুদ্রিত রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে টেবিলে করে প্রদর্শন করে, আফিয়া ঠিক ওভাবে করে কুরআন নিয়ে বসত। ওর টেবিলে লেখা থাকত আপনার জীবনের ফ্রী এনসাইক্লোপিডিয়া (মুক্ত বিশ্বকোষ)। ওর সব টাকা কুরআনের এসব কপি কেনার পেছনে ব্যয় করত। সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় অনেকেই জিজ্ঞেস করত এই বই সম্পর্কে। তাদেরকে আফিয়ার সহজ জবাব ছিল, এটা আপনার জীবনের সব জ্ঞানের আধার।

মাঝেমধ্যে আমি ওকে বলেছি কুরআনের পাশাপাশি কিছু সাহিত্যের বইও রাখতে। কিন্তু ও তখন বলেছে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর দাওয়াতের পদ্ধতি এমন ছিল না। তিনি (صلى الله عليه وسلم লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন না। তিনি কুরআনের আয়াত থেকে তিলাওয়াত করতেন। তার যুক্তি থাকত কুরআন থেকেই। তার দাওয়াত আবর্তিত হতো কুরআনের বক্তব্যকে ঘিরেই। আফিয়া প্রায়ই সেসব লোকদের জন্য আফসোস করত যাদের প্রচুর জ্ঞান আর মেধা থাকা সত্ত্বেও তারা সহজ একটা ব্যাপার বোঝে না। সে আমাকে তার ক্লাসের এক বান্ধবীর সম্পর্কে বলেছে যে দুশ্চিন্তা কমাতে গান শুনত। আর চাপ খুব বেড়ে গেলে সে যেত ডিস্কো বার-এ। যার প্রধান দরজায় লেখা ছিল, “নরকের প্রবেশমুখ”! আফিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল, তারা নিজেরাই তাদের দরজায় লিখে রেখেছে নরকের প্রবেশমুখ, তবুও লোকে তার ভেতর যাচ্ছে কী করে! ওর বন্ধুরা ওকে জিজ্ঞেস করত কিভাবে সে মিউজিক, বার, ওয়াইন ছাড়া এত এত চাপ সামলায়। আফিয়া বলত সে কুরআন তিলাওয়াত শুনেই ওসব চাপ মোকাবেলা করতে পারত।

যেমনটা বলছিলাম, বৃদ্ধদের প্রতি আফিয়ার আলাদা একটা টান ছিল। আমেরিকায় গিয়েও আফিয়া প্রায়ই বৃদ্ধাশ্রমে যেত। বয়স্কা মহিলাদের দেখাশোনা করত, গোসল করিয়ে দিত, চুল আঁচড়ে দিত। কখনো কখনো মানসিক রোগীদেরও সেবা করতে যেত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। আমি কয়েক বার জিজ্ঞেস করেছিলাম এসব প্রতিবন্ধী শিশুর সেবা

করে কেন সে, যারা কিনা বিনিময়ে একটা ধন্যবাদও দিতে পারবে না। এদিকে আশ্রমের বৃদ্ধরা অনেকেই তো আরও অকৃতজ্ঞ। পারলে অভিশাপ দেবে বরং। আফিয়া বলেছিল কৃতজ্ঞ লোকের জন্য তো সেবা করার মানুষের অভাব নেই। এই দুর্ভাগা মানুষগুলো কারো যে-কোনো সুনজর থেকে বঞ্চিত। এজন্য আমি তাদের সেবাই করি। যেগুলোর কথা বললাম এগুলো তার শখের কিছু নমুনা ছিল। কিন্তু তার অন্য এক স্বপ্নের স্থান ছিল সবকিছুর ওপরে। আর সেই স্বপ্ন ছুঁতেই সে খেটেছে সবচেয়ে বেশি।

আফিয়া ব্র্যান্ডিজ থেকে পিএইচ.ডি. সম্পন্ন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'অনুকরণের মাধ্যমে শেখা'। লোকে যে বলে সে নিউরোসার্জন বা পরমাণু বিজ্ঞানী ছিল এগুলো সব ভুয়া কথা। তার পারদর্শিতা ছিল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। বিশ্বাস করত দেশের ভাগ্যই বদলে দেওয়া সম্ভব যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়। সে এমন এক পাঠ্যক্রম তৈরি করছিল যা বাচ্চাদের জন্য সহজবোধ্য এবং একইসাথে আনন্দদায়ক হবে। এজন্য সে দশ বছরের একটি সিলেবাস তৈরি করে আমাকে দেখিয়েছিল। আমি চমকে উঠেছিলাম সেখানে ইসলামিক স্টাডিজ নামে কোনো বিষয় না দেখে। কারণ জানতে চাইলে আফিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে আমাকে জানায় যে, ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং সমস্ত বিষয়ের মূল উপাদান।

এরপর যখন আমি সেই সিলেবাসটি বিস্তারিতভাবে দেখতে লাগলাম, বুঝতে পারলাম সে প্রতিটা বিষয়ই ইসলাম এবং কুরআনের সমন্বয়ে সাজিয়েছে। সে বিশ্বাস করত আধুনিক গবেষণা আর আবিষ্কার প্রকৃতার্থে নতুন নয়। বরং এগুলো সব ইসলামের মূলনীতিতে প্রোথিত জ্ঞান থেকেই আহৃত। এখন আমার মনে হয়, যদি আমাদের হর্তাকর্তারা তার শিক্ষানীতির গুরুত্ব বুঝত, আমাদের সার্বিক অবস্থা অনেকখানি উন্নত হতে পারত। আমাদের যুবসমাজকে তাহলে আজ আর বিদেশের ভিসার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হতো না। বিশ্বাস করুন, আফিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি চালু হলে পনের বছরের মধ্যেই দেখা যেত বিদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে আসতে শুরু করেছে।

আমাদের প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েট হতো কুরআনের হাফিজ৷ ইসলামের ভাবগাম্ভীর্যের সাথে, কুরআন বুঝতে পারার সাথে তাদের পরিচিতি থাকত খুব বেশি৷ কী চমৎকার ব্যাপারই না হতো সেটা!

আমি এখন জানি কোনো জিনিসটা আমেরিকাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছে৷ কেন আফিয়াকে এ দুঃসহ পরিণতি সয়ে যেতে হচ্ছে৷ বিচারকরা সবকিছু জানার পরও তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে৷ ছিয়াশি বছরের সাজা দিয়েছে৷ বিচারক বলেছে তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণাদি নেই তবুও এমন রায় তারা লিখেছে পাকিস্তানের আইনজীবীদের রায়ের আলোকে৷

আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন আফিয়াকে... আফিয়াকে... ওহ কিভাবে বলব আমি, আফিয়াকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে পাঁচ পাঁচজন পুরুষ আমার ছোট বোনটার দেহে তল্লাশি চালিয়েছে৷ তারপর ওরা কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছে৷ আর আফিয়াকে বলেছে এর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে৷ কিভাবে ও পারবে কুরআনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে! হ্যাঁ! কী করে সম্ভব? ওরা আফিয়াকে এভাবে হাঁটার জন্য বাধ্য করত৷ কাপড় পরতে দিত না৷ নগ্ন করে রাখত৷ যতক্ষণ না হাঁটবে কুরআনের পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে, ততক্ষণ কাপড় দিবে না৷ আফিয়া আমাদের ভাইয়ার সাথে দেখা করতে চাইলেও ওরা এই কাজ করত৷ আইনজীবীর সাথে কথা বলতে চাইলেও একই ঘটনা৷ ওরা এসব করে করে রিপোর্ট করত আফিয়া ওদের কাজে সহযোগিতা করছে না!

ছিয়াশি বছরের কারাদণ্ড পাওয়া আফিয়ার সাথে এই ছিল তাদের ব্যবহার৷ তার নিজের ভাই কোর্টে উপস্থিত ছিল, কিন্তু দেখা করার অনুমতি পায়নি৷ তারা ওর মাথা থেকে স্কার্ফ টান দিয়ে খুলে ফেলে৷ এরপর একে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে৷ তারা ওর কাছ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নেয়৷ সেই কুরআন যা ওকে সান্ত্বনা দিত, সাহস যোগাত৷ আফিয়া আদালতকে জানিয়েছে ওর কোল থেকে নবজাতক সন্তানকে ছিনিয়ে

নেওয়াকেই তার কাছে মৃত্যুসম মনে হয়েছিল৷ কিন্তু কুরআন কেড়ে নেওয়ার তুলনায় সন্তান হারানোর সেই অনুভূতি তার কাছে কিছুই না৷

-ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী

দুই কারাবন্দির গল্প

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০৷ আফিয়াকে মার্কিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করে৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মার্কিন সৈন্যদের হত্যা চেস্টা৷ শাস্তি হিসবে তাকে ৮৬ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং এই সময়ে তাকে নির্জন কারাগারে সব সুযোগ সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে বলা হয়৷ জজ রিচার্ড বারম্যান তাকে সাজা শোনায়৷ মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সাজাতে এক বারের জন্যও ২০০৩ সালে আফিয়াকে গুম এর কথা কিংবা গোপন কারাগারে তাকে এবং তার সন্তানদের নির্যাতনের কোনো বিবরন ছিল না৷

ঠিক এরপরের বছরেই, আমরা পাকিস্তানের আরেক নাটক উপভোগ করলাম৷ সিআইএ কন্ট্রাক্টর রেমন্ড ডেভিস প্রকাশ্য দিবালোকে দুই পাকিস্তানি যুবককে হত্যা করে৷ সেই হত্যাকারীর বন্ধু তাকে মার্কিন দূতাবাসে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে সহায়তা করতে গিয়ে আরেক পাকিস্তানিকে হত্যা করে৷

যারা নিজেদের আইনের শাসক বলে দাবি করে আজ তারাই আইনের ফাঁক ফোঁকর খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আইনের শাসন এড়াতে! মানবাধিকারের কথিত রক্ষকরাই

আজ একজন ঠান্ডা মাথার খুনীকে উল্টো ভিকটিম বানাতে বানাতে ব্যস্ত। তারা এত ভীতু কাপুরুষ যে নিজেরাই যাকে ‘জাতির কন্যা’ নামে ডেকেছে তাকে একটা সামান্য চিঠি লেখার সাহসও পায় না। তারাই কিনা আজকে রাত দিন আইনের জন্য কাজ করে ‘উল্টে ফেলবে’ বলে জনগনের কাছে ওয়াদা করছে!

তারা আজকে কূটনৈতিক চুক্তি আর ভিয়েনা কনভেনশনের কথা বলে। সেদিন কোথায় ছিল ভিয়েনা কনভেনশন যেদিন আফিয়াকে পাকিস্তান ও গজনি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল? কোথায় ছিল তার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা? সে পাকিস্তানি ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তি কে? সেতো পাকিস্তানের কেউ না। কখন ভিয়েনা কনভেনশন এক পাক্ষিক চুক্তিতে রুপান্তরিত হলো? অথবা এটা হয়ত সব সময় এমনি ছিল। হয়ত সবই এক পাক্ষিক। তাহলে কেনো আমাদের তাদের দরকার? কেনো তারা আছে?

কেনো তাকে কবর দিতে তাড়া? রেমন্ড আসলে কি জানে? আরেকটা জরুরি বিষয় হচ্ছে, সে আসলে কি করছিল? তারা আসলে কি প্রকাশ হবার ভয় পাচ্ছে যার কারনে স্বচ্ছ, স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি দিচ্ছে না? তারা কি আসলে সেই ভয়টাই পাচ্ছে যে, তারা যা আফিয়ার সাথে করেছিল তা এক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়ে যাবে? সত্য বলতে তারা সকলে মিলে উঠে পরে লেগেছিল যাতে আফিয়া আর কখনো মুক্তি না পায় আর এখন তারাই চাচ্ছে যাতে ডেভিস খুব দ্রুত মুক্তি পায়। যাইহোক, আমি বলতে চাই, তাদের মুখোশ একদিন উন্মোচিত হবেই হোক আজ অথবা কাল। যেমনটা বলেছেন এক বিখ্যাত মার্কিন সংগীত তারকা ‘সময় সেতো পরিবর্তনশীল’।

আমরা দেখেছি কিভাবে এক ঠান্ডা মাথার খুনীকে উল্টো ভুক্তোভোগী বানানোর চেষ্টা চলছে। আমরা দেখছি কিভাবে তারা আমাদের মিথ্যা আশ্বাসে নেশার ঘুম পারিয়ে আমাদের চুপ করানোর চেস্টা চালাচ্ছে। সরকার থেকে শুরু করে তাদের বেতনভুক্ত

দাসেরা আমাদের একত্রিত হওয়া থেকে বিরত রাখছে। আর এই কারনে আমরা আফিয়ার সাথে রেমন্ডের বন্দি বিনিময় চুক্তি বাতিল করেছি।

আমরা এক সমৃদ্ধ, সম্মানীত এবং মহানুভব জাতি যাদেরকে কিনা কিছু বিদেশী সাহায্য, কিছু সামাজিক ভণ্ডামি আর পরস্পর এর প্রতি অনাস্থার কারনে মাথা নোয়াতে হয়েছে। আমরা অন্যের থেকে সম্মান আশা করি অথচ আমরা নিজেদের সম্মান করি না, আমাদের দেশের নাগরিকদের সম্মান করি না। কারো থেকে আশা করার আগে আমাদের উচিত নিজেরা নিজেদের সম্মান করতে শেখা। মানুষ হিসেবে আমাদের একে অন্যকে মুল্যায়ন করা উচিত।

আফিয়া মূলত আমাদেরকে একটি অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছে। মি. রেমন্ড শুধু মাত্র বিদ্রুপের সুরে আমাদের সেই চ্যালেঞ্জ মনে করিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন পরিস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সুশীলসমাজ, আমাদের রক্ষনশীলতা, আমাদের রাজনৈতিক নেতা, আমাদের বিচার ব্যবস্থা সব কিছুকেই যেন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের প্রতি কে কি মনোভাব রাখে।

বর্তমানে পুরো বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের মূল্য অপরিসীম। পুরো বিশ্বের কাছে পাকিস্তান পরিনত হয়েছে পাঞ্চিং ব্যাগে, আর সব দোষের দায় দেবার জন্য সহজ লক্ষ। আমাদের দ্বীন, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের সম্মান আজ ধুলিসাৎ হয়ে গেছে আর আমরাই এটা হতে দিয়েছি।

আমরা আমাদের উত্তর-পশ্চিমের গ্রামগুলোতে ড্রোন হামলা চালিয়ে আমাদের নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করতে দিয়েছি৷ কিন্তু এগুলি ছিল পাঠান, তালেবান বা যাই হোক না কেন৷ কিন্তু আমরা নই!

আমরা পাঞ্জাবে বোমা হামলা চালাতে দিয়েছি৷ কিন্তু তারা ছিল পাঞ্জাবি আর তালেবান! আমাদের তো কেউ না!

করাচিতে প্রতিদিন হত্যাকান্ড চলতে দিয়েছি৷ এখানেও হত্যাকান্ডের স্বীকার হচ্ছে মুহাজির কিংবা সিন্ধিরা অথবা সেই পাঠানরা৷ এরা আমাদের তো কেউ না!

বেলুচিস্তান থেকে মানুষ নিখোঁজ হচ্ছে, তাদের লাশ পাওয়া যাচ্ছে৷ এরা বেলুচিস্তানকে যারা আলাদা করতে চায় তারা! আমাদের তো কেউ না!

আফিয়ার মতো শত শত আরো অনেককে আমরা বিক্রি করে দিয়েছি৷ যারা নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে৷ হয়ত তাদের কেউ দোষী ছিল! যাই হোক! এরা তো আমাদের কেউ না!

সত্য হচ্ছে এরা সবাই আমাদের অংশ আর আমরা এদের অংশ৷ আমরা চাই বা নাই চাই, আমরা পছন্দ করি বা না করি তারা আমাদের পরিবারের অংশ৷ আর পরিবার তো তৈরি হয় মন্দ ভালো নিয়েই৷

আমি এই কথা গুলো সেই সব পাকিস্তানিকে বলতে চাই যারা আফিয়াকে ঘৃনা করে৷ সে এখনো আমাদের অংশ, আমরা তার অংশ৷ তার সাথে কি আচরণ করা হয় এবং আমরা

এর বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়াতে পারি সেটার উপরই নির্ভর করবে আমরা কি পরিমান সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। একবার তাকিয়ে দেখুন আমেরিকনারা তাদের রেমন্ডের জন্য কি করছে? সে শুধুমাত্র একজন স্কাউট এবং তাদের দেশের নাগরিক আর তাতেই তারা তার জন্য এত কিছু করছে।

আফিয়া নিখোঁজ হবার এই বার্ষিকীতে আমাদের ক্ষতগুলো গভীর আর তাজা হয়ে উঠেছে। আল্লাহ আমাদের মধ্যে প্রেরনা জাগ্রত করেছে। আমি জানি না এর উদ্দেশ্য কি। কিন্তু যেহেতু আমরা আফিয়াকে জাতির কন্যা হিসাবে ডেকেছি কাজেই তার ব্যাপারগুলো আমাদের জন্মভূমির সাথে জড়িত। সে সকল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে আমাদের জন্য ঐক্যের ডাক দিয়ে গেছে। আফিয়া আমাদের কাছে এমন একটা বিষয় যাকে পাশ কাটানোর কোন সুযোগ নেই।

আজকের দিনে মি. ডেভিস আবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে কি পরিমান সম্মান আমাদের প্রাপ্য আর আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কতটা নাগরিকদের ব্যাপারে ভাবে আর তারা কতটা মিথ্যাবাদী। রেমন্ড আমাদের পশ্চিমের সেই উগ্র মনোভাব দেখিয়েছে যেমনটা দেখিয়েছিল সেই মার্কিন কর্মকর্তা যে আফিয়াকে ২০০৮ সালে গুলি করেছিল।

আমার জন্য গত সপ্তাহের মধ্যে সব থেকে সুখের মুহুর্ত ছিল রেমন্ডের রোষানলের স্বীকার হওয়া সেই ভুক্তভোগীর পরিবারগুলোর সাথে সাক্ষাৎ। এরাই সেই মানুষ যারা আমাকে দেশের প্রতি বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছে। সত্য বলতে আমাদের এই জাতির বেঁচে থাকার প্রেরনা হচ্ছে আমাদের দেশের সাধারন মানুষের অন্তরের ভালোবাসা, বিশ্বাস, উদারতা আর সামনে সুদিনের আশা। আমি তিনজন মা, দুইজন গর্ভবতী স্ত্রী আর তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে দেখা করেছি। আমি তাদের মধ্যে ক্ষোভ আর রাগকে দেখেছি। কিন্তু এরপরেও তারা রেমন্ডের বিনিময়ে আফিয়াকে ফিরিয়ে আনার শর্তে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে রাজি হয়েছে। যদিও আফিয়ার দুঃখজনক

ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোন তুলনাই চলে না। এমন একজনের জন্য এই ধরনের ভালোবাসা যাকে তারা চিনে না ব্যাপারটা আমার হৃদয়ে দাগ কেটে গেছে। তারা আফিয়ার মুক্তির ব্যাপারে চুক্তি করার জন্য স্ব-প্রণোদিত ভাবেই বলেছে। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি তাদের অন্তরের মধ্যে যে ব্যথা রয়েছে তার সাথে কোনো চুক্তি হতে পারেনা।

আমি দু'য়া করি আমরা যেন প্রত্যেকে এই ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের মাঝে জাগ্রত করতে পারি। দুনিয়ার বিচারে হয়ত এই লোকগুলো সম্পদশালী নয় কিন্তু এরা আবার দেশকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আমাদের নেতারা যারা আফিয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের এই লোকদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হওয়া উচিত।

'আফিয়া মুভমেন্ট' কোনো রাজনৈতিক আদর্শে তৈরি হয়নি বরং এটা তৈরি হয়েছে আদর্শের ভিত্তিতে। এটা পুরো জাতিকে এই ছোট্ট একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছে যে 'আফিয়াকে স্ব-সম্মানে ঘরে ফিরিয়ে আনা হোক'। যখন আমরা আমাদের 'জাতির কন্যার' সম্মানের জন্য দাঁড়াতে পারব সেদিনই আমরা প্রকৃত অর্থে আমাদের হারানো সম্মান ফেরত পাব। আজকে আফিয়ার জন্য ধার্মিক, সেক্যুলার সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে প্রামান করে দিয়েছে যে আমরা এক জাতি। আজকে যখন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি সবাই এক কাতারে জড়ো হয়েছি তখন বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করার সময় এসেছে আমাদের পতাকার সাদা ডোরা গুলো সত্য। যখন আফিয়ার সম্মানার্থে সকল রাজনৈতিক দল তাদের পতাকা অর্ধনমিত করে আমাদের জাতীয় পতাকার নিচে একত্রিত হয়েছে তখন আমার বলতে ইচ্ছা করে 'আমরা গর্বিত জাতি'।

এই দুই বন্দির অন্তিম পরিণতির ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। কাজেই আসুন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কে মর্যাদাবান বানাই, লজ্জাজনক না।

-ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী

একটি বাদামী বাক্সের গল্প

গল্পটা একটা বাদামী বাক্সকে নিয়ে। একেবারেই সাদাসিধে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। না বড়, না ছোট, না ওইরকম কিছু। অমূল্য সব মালসামানা থেকে এক্কেবারে টয়লেট পেপার, সব কিছুরই গাট্টি বোঁচকা বাঁধা জন্য এ এক রোজদিনকার ব্যবহারি বাক্স।

কয়েক মাস আগে বাসায় ফিরে এসে দেখি বাক্সটা দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। আজব ব্যাপার! আমি তো কিছু মেইলে অর্ডার করিনি! কোনো কিছু তো আসার কথাও নয়। দুর্ভাগ্যবশত, সেই দিনগুলোতে এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বাক্স পাওয়াটা যতটা না উত্তেজনাকর কৌতূহলের ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল ভয় জাগানিয়া।

তারপরই নজরে এল বাক্সের এক পাশে বড় বড় করে একটা নাম আর নাম্বার লেখা। বহুদিনের চেনা হাতের লেখা। নামটাও বড় চেনা। কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন অবশ হয়ে গেলাম। কিভাবে এই বাক্সটা আমার কাছে এল আর কেনই বা আমার কাছে পাঠালো!

বাক্সটা ভেতরে নিয়ে এলাম। তখনো জানতাম না কি করবো এটাকে নিয়ে। ভয় আর কৌতূহল, দুটোই একসাথে কাজ করছিল। উকিল আর বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে চেক

করালাম বাক্সটা৷ কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওটা যেখানে ছিল সেখানেই আবার তাকে ফেলে রাখলাম৷ প্রতিদিন বাসায় ফিরে এসেই দেখতাম এটাকে৷ বাক্সটা যেন আমার দিকে চেয়ে থাকতো৷ জানতাম আমি এটাকে খুলতে চাই৷ এই ঘটনাটা, যাকে বলে উভয়সংকট, এটার এত ফিরিস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটাই- বিগত সাড়ে ছয় বছরের ঘটনাগুলো কিভাবে আমাদের জীবনকে ভিন্ন এক রূপ দিয়েছে৷ কিভাবে নরমাল রুটিন ওয়ার্কগুলো পর্যন্ত জটিল অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ সন্দেহ, আতঙ্ক, উদ্বেগ আর অপেক্ষা, সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল৷

সিদ্ধান্তে এলাম শেষতক - খুলেই ফেলব

বাক্সটার কাছে ফিরে গেলাম৷ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম বাক্সটা খুলে ফেলার৷ এমন না যে দিনটা খুব শুভ বা বিশেষ কোন দিন৷ কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিলো আজকেই সময়৷ সাক্ষী হিসেবে রাখলাম ক্যামেরা আর ভিডিওকে৷ তারপর বাক্সের টেপ কেটে আলগোছে সরিয়ে ফেললাম বাক্সের ঢাকনা৷

বাক্সের ভেতরে এলোমেলোভাবে কিছু জিনিস ভরে দেওয়া হয়েছে৷ বাক্সের উপর সুন্দর লেখাটার সাথে ভেতরের এই অবস্থাটা একেবারেই মিলছে না৷ নিশ্চিত দুটো কাজ এক লোকের না৷ একটা মানুষ একইসাথে তাড়াহুড়োপ্রবণ আবার সংবেদনশীল হতে পারে না৷

ধীরে সুস্থে একটা একটা করে জিনিস বের করতে লাগলাম৷ হাত কাঁপছিল আমার৷ দুটো ভাঁজ করা সাদা স্কার্ফ৷ বেশ কয়েকটা খাম৷ রাইটিং প্যাড, কিছু অসম্পূর্ণ চিন্তা তাতে লেখা৷ দেখে মনে হচ্ছিল লেখার মধ্যে থেকে কেউ যেন টান দিয়ে প্যাডটা ছিনিয়ে নিয়েছে৷ বহু দূরদূরান্তের লোকজনের চিঠি৷ অস্ট্রেলিয়া, হাওয়াই, পাকিস্তান, আরকানসাস থেকে আসা৷ স্ট্যাম্পগুলো এখনো জায়গামতনই লাগানো৷ কিন্তু যাদের

কাছে এই অসম্পূর্ণ চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল তাদের আর এগুলো পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিছু অসম্পূর্ণ কবিতা, যার শেষটুকু অজানা। কয়েকটা ম্যাগাজিন থেকে কিছু আর্টিকেল আলাদা করে রাখা। কিন্তু কেন? জানার উপায় নেই। মাঝখানে ছেঁড়া একটা কুরআন। একসময় নিখুঁত বাঁধাই ছিল এটার। যে মানুষটার কাজ এটা সে আর এই রেফারেন্স ব্যবহার করার মত অবস্থায় নেই। এ ছাড়া বাক্সের মধ্যে কিছু খাবারের দেখা মিললো। টি ব্যাগ, কুকিজ, মাছ, কিছু স্ন্যাক্স। এগুলো আর এর মালিকের কপালে নেই।

খুব সাবধানে জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। বলা যায় একেবারে বৈজ্ঞানিক স্টাইলে। যেন আমি খুঁজে পেয়েছি কোনো গুপ্তধনের ভাণ্ডার। কি পেলাম তার লিস্ট বানানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে ব্যক্তিগত জিনিসগুলো হাতে আসতে লাগলো। একটা একটা জিনিস আমার হাতে আসছিল আর বাস্তবতা আঘাত করছিল আমাকে, বড় কঠিনভাবে!

উপলব্ধির আঘাত

টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থের কার্সওয়েল মেডিকেল সেন্টার। বাক্সটা এসেছে ওখান থেকেই। বাক্সে লেখা নামটা ছিল আমার বোন আফিয়ার, নাম্বারটা ছিল #৯০২৭৯-০৫৪।

আফিয়ার দুনিয়াবি জীবনে যা কিছু ছিল এই বাক্সটা সেসবেরই কুঠুরি। এই জিনিসগুলোই গত ৮ মাস ধরে সে জমিয়েছে। এই ৮ মাস আফিয়ার কেটেছে সেই প্রতিষ্ঠানে যেটা ‘আতঙ্কের ঘর’ নামে পরিচিত। আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা কষ্ট দেয় তা হচ্ছে, কোনো ওয়ার্নিং ছাড়াই হঠাৎই একদিন ওকে তুলে নেওয়া হয়। কোনো কাজ বা কোনো একটা চিঠি শেষ করা কিংবা কোনো বিশেষ দাওয়াতে খেতে যাওয়া নয়তো শেষ একটা চিঠি পাঠানো- কোনোটাই ওকে শেষ করতে দেওয়া হয়নি। ওর জন্য সেই সময়

ছিল না। ওর সবকিছু, ওর স্কার্ফ আর প্রিয় কুর'আনের মুসহাফ, সবকিছুই ওকে পেছনে ফেলে যেতে হয়েছিল।

ওকে নগ্ন করে তল্লাশি করেছিল ওরা। শুধু তার শরীরটাকেই ওরা নিয়ে গেল, কোনোকিছু ছাড়া। এটা মরে যাওয়ার মতো, আমার যা মনে হয়। সেই সব জিনিস যেগুলো শেষ করা যায়নি। যেগুলো আমরা ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ পর করবো নয়তো কাল করে ফেলবো। প্রিয় কাপড়, প্রিয় বই, প্রিয় খাবার। দিনশেষে ওরা যখন নিয়ে যায়, শুধু আপনাকেই নিয়ে যায়। একটা মূহুর্তের জন্য আমি অন্য কিছু আর ভাবতে পারছিলাম না। আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম এটা হয়তো আফিয়ার জন্য স্রেফ আরেকটি “দ্য জাঁ ভু” (আগেই দেখে ফেলা হয়েছে এমন কিছু) ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩১ মার্চ, ২০০৩। আফিয়ার পুরো জীবনকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল যখন তাকে তার তিন বাচ্চাসহ করাচির রাস্তা থেকে হুট করে তুলে নেওয়া হয়েছিল। কেমন লাগতে পারে এটা? আপনি আপনার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি হারিয়ে ফেলেছেন, আপনার জীবনের চেয়েও মূল্যবান সে জিনিস - আপনার সন্তান। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা মাত্র ৬ মাস বয়সী!

আমরা জানি না আফিয়াকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জানি না সেই মূহুর্তে আর গত বছরের জুলাইয়ে হঠাৎ গজনীতে তার উদয়, এই মধ্যিখানের সময়টুকুতে তাকে ঠিক কতটা যন্ত্রণা সয়ে যেতে হয়েছে। সেখানে ওকে গুলি করা হয়েছে এবং আবারো কেড়ে নেওয়া হয়েছে সবকিছু, যা ছিল শুধুই ওর। দ্বিতীয়বারের মতো ও হারিয়েছে ওর ছেলেটাকে, যার ব্যাপারে সে জানতোও না যে ছেলেটা কি বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। খুব অল্প কিছু মুহূর্ত আগেই মা ছেলের মিলন হয়েছিল এবং ছেলেটা চিনতেও পারছিল না যে এই তার মা!

জীবন, মৃত্যু আর সময়ের পাঠ

তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আফিয়া বারবার মুখোমুখি হয়েছে এরকম অসংখ্য মৃত্যুর। "ওরা আমাকে মেরে ফেলেছে" - ওর এই কথাতে তাই অবাক হবার কিছু নেই। যতবারই ওরা আফিয়াকে 'ট্রান্সফার' করেছে, প্রত্যেকবারই সেটা ছিল মরণের সমান। ও বাধ্য হয় বারবার জেগে উঠতে আর দুঃস্বপ্নেরা এভাবেই ঘুরতে থাকে অবিরাম। অবাক হই এই ভেবে যে, আল্লাহ আফিয়াকে কেনো এরকম একটা অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে রেখে দিচ্ছেন? কখন এটা যথেষ্ট হবে? নাকি এটা তাদের সবার জন্য একটা শিক্ষা যারা এই ঘটনাগুলো ঘটতে দেখছে?

আমি ভাবতাম আফিয়ার বলা "আমাকে মেরে ফেলেছে" কথাটা স্রেফ একটা রূপক। কিন্তু না, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এটাই বরং বাস্তবতার সবচেয়ে কাছাকাছি। একবার ভাবুন, এত বছরের বন্দিজীবনে এটা তার সাথে কতবার ঘটতে পারে, যখন গতবছরের তার "উন্মুক্ত" প্রকাশ্য বন্দিদশায় আমরা নিজেরাই এর সাক্ষী হয়েছি অন্তত তিনবার! বাদামী বাক্সটা এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হ্যাঁ, আবারো সেই বাদামী বাক্সটার কাছেই ফিরতে হচ্ছে আমাদের। কারণ গল্প এখানেই শেষ নয়। বাক্সটা বাড়ির সামনেই পড়ে রইলো, জিনিসপত্র সব আবার ফেরত গেলো এর ভেতরে। তারপর একদিন আবার বাক্সটার দিকে তাকালাম আর একই সাথে যেন দেখে ফেললাম 'ফারাও'দের চিন্তাগুলো। কিভাবে তারা বানিয়েছিল তাদের পিরামিড, যাতে করে দুনিয়াবি জিনিসগুলোকে যত্নের সাথে জড়ো করে সাথে নিয়ে যেতে পারে মৃত্যুপরবর্তী যাত্রায়। বাইরের স্থাপত্যে কি নিখুঁত যত্নের ছাপ অথচ ভেতরটা ঠিক সমান অগোছালো। সাথে আছে বিরাট মজুদ, খাবারের, কাপড়ের, অলংকারের...

বাদামী বাক্সটাও ঠিক এমনি। সাদাসিধে সাফসুতরো বাহিরটুকুতে নজরকাড়া হাতের লেখা। আর ভেতরটা পিরামিডের মতোই জীবনের অনুষঙ্গ দিয়ে এলোমেলো করে রাখা।

কিন্তু দুটোকে এক মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। খুব বড় একটা পার্থক্য লুকিয়ে আছে ফারাওদের পিরামিড আর আফিয়ার বাদামী বাক্সের মধ্যে। একটা ছিল পরিকল্পিত। আর আরেকটা দেখিয়ে দেয় জীবন কিভাবে আচমকা শেষ হয়ে যায়। বাস্তবে ফারাওদেরও এমন একটা বাদামী বাক্স ছিল যাতে জমা থাকতো তাদের জীবনের সব অসমাপ্তিগুলো। কারণ তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতো ঠিক, কিন্তু জানতো না কখন সেটা আসবে।

এতদিনে বাদামী বাক্সটা রীতিমতো চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে আমার। বাচ্চারাও এটার ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। বাক্সটাকে তাই নিয়ে আসলাম চিলেকোঠায়। এখানে এটা সঙ্গী হিসেবে পেল তার মতোই আরো অনেক বাদামী বাক্সকে যাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমার জীবনের ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো আর বস্তুগত কিছু মালামাল যেগুলো বহুদিন ধরে আমি দেখিনি। এমনকি খুব সম্ভবত এগুলোর কথা মনেও পড়তো না যদি না আবার এগুলোর সাথে দেখা হয়ে যেতো। তাদের দেখে আমি আনমনা হয়ে যাই। আমার মনে হতে থাকে আমি আর ওরা যেন একদিন আবার সেই পুরনো সুন্দর দিনগুলোতে ফিরে যাবো!

হঠাৎ আমাকে একটা চিন্তা এসে আঘাত করলো। এই যে ডজনখানেক বাদামী বাক্স পড়ে রয়েছে, এগুলো বহন করছে আমার জীবনের ভুলে যাওয়া কিছু টুকরো সময়কে। আর আফিয়ার এই একটা বাদামী বাক্স প্রতিনিধিত্ব করছে তার পুরো জীবনের! কিন্তু বেঁচে যেহেতু আছে তাই হয়তো আরো অনেক ‘জিনিসই’ সে জমানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু আর কতবার এগুলো কেড়ে নেওয়া হবে ওর কাছ থেকে? আর কতবার মরতে হবে ওকে? আর কত বাদামী বাক্স আসবে?

আমি বাক্সটাকে চিলেকোঠাতেই ছেড়ে এলাম। কিন্তু আমার ঘুমের বারোটা বেজে গিয়েছিল। তাই একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার এটাকে নিয়ে এলাম। এবার এটাকে রাখলাম আমার স্টাডি রুমে। একেবারে রাস্তার উপরে না, কিন্তু এমন জায়গায় রাখলাম যেখান থেকে আমি বসে বাক্সটাকে দেখতে পাবো। আমি আফিয়ার জীবনটাকে এভাবে স্রেফ চিলেকোঠায় রেখে দিতে পারিনি যাতে করে এটা আমার জীবনের আরেকটা ভুলে যাওয়া অংশে পরিণত হয়। আমাকে এটা দেখতে হবে প্রতিটা দিন। কারণ আমার বোন আফিয়া আমার ভাবনায়, আমার চিন্তায় জুড়ে থাকে সারাটাদিন আর যতদিন সে বেঁচে আছে বাদামী বাক্সটা তার জন্য অপেক্ষা করবে। যাতে করে একদিন সে ফিরে এসে শেষ করতে পারে তার সেই শেষ না করা চিঠিগুলো, আধলেখা কবিতাগুলো আর রয়ে যাওয়া অল্প একটু চা।

তো, আপাতত গল্পটা শেষ হল না। হবে হয়তো কোনো একদিন...... আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন এই শেষটুকু তিনি করে দেন মধুরেণ সমাপয়েৎ।

-মুহাম্মাদ সিদ্দিকী

(আফিয়া সিদ্দিকীর বড় ভাই)

এমআইটি থেকে কার্সওয়েল হাজতের স্মৃতি

[লিখতে শুরু করার আগে আমি দু'রাকাত সালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। আফিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পরপরই আমি এটা লিখেছি, কিন্তু সত্যি বলছি লেখাটা প্রকাশ করার মতো সাহস আমার ছিল না। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, নিষেধ করছিল। ওরা নিজেরাও আসলে তখনকার পরিস্থিতির কারণে ছিল আতঙ্কিত। সবাই মিলে আমাকে বলছিল, "এসব লিখলে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে।" কেন ধরে নেবে? একটা ব্লগপোস্ট লেখার অপরাধে?

ভয়, আতঙ্ক এসব বড্ড আজব জিনিস। ইয়া আল্লাহ, আমি যেন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো ভয় না করি। আমীন।]

টেবিলটা গোছানো শেষে আফিয়া আপু 'প্লে বাটন' চেপে দিলেন। টানটান করে বেঁধে নিলেন ওঁর ফুল ফুল ডিজাইনের স্কার্ফটা। এরপর আমাকে ইশারা করলেন যেন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত চালাই। ওটা ছিল একটা ডকুমেন্টারি। বসনিয়ায় ঘটে যাওয়া বর্বরতা নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি।

দেখতে দেখতে আমার মনে জড়ো হওয়া সব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয়ে গেল আফিয়া আপুর দরদভরা দৃপ্ত কণ্ঠ শুনে। ওয়েলসলি (Wellesley) ক্যাম্পাসের স্ল্যাটার হলে সেটাই ছিল আমার প্রথম কোনো বুথে বসার ঘটনা। আমাদের পাশের বুথেই বসেছিল স্থানীয় এক আমেরিকান মেয়ে। রূপার অলঙ্কার বিক্রি করছিল সে। মেয়েটা আমাদের হাতে বাড়তি কয়েকটা প্রচারপত্র ধরিয়ে দিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

আফিয়া আপু, আমার সেই বোন, যিনি ছিলেন গ্রেটার বোস্টন মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন'র (MSA) প্রাণ। তার কথা ভাবলে আমার এমনটাই মনে হয়। ওয়েলসলি কলেজে আমি তখন মাত্র প্রথম বর্ষে পড়ি। আর আমার হবু স্বামী তখন MIT

(ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি) তে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আফিয়া আপু সেই সময় শত শত সমুচা ভেজে আনতেন সেগুলো বিক্রি করে MSA তহবিলের অর্থ তোলার জন্য।

তিনি ছিলেন প্রচণ্ড উদ্যমী একজন কর্মী। শত শত বসনিয়ান এতিমকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি আমেরিকায় খুঁজে খুঁজে মুসলিম পরিবার বের করেছেন। নিজেকে আমি আফিয়া আপুর সাথে এভাবে মেলাতে পারি। আমারও ছোটবেলা কেটেছে আফ্রিকায়। এবং তার মতোই আমিও পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় এসেছি, পড়াশোনার জন্য। এখানে এসে কিছু মেয়েকে আমি আলাদা করে লক্ষ্য করি। তারা সবাই ছিলেন মেধাবি, শিক্ষিত, ধার্মিক এবং পর্দানশীল। সেই ১৯৯০ সালের দিকে পর্দানশীল, ধার্মিক পাকিস্তানি মেয়ে তেমন একটা দেখা যেত না। পাকিস্তানি মেয়েরা ‘স্বাধীন’ হয়েছে সত্তর-আশির দশকে। তাই আমার বয়সী, আমাদের সামাজিক অবস্থানের কেউ পর্দা করত না। কিন্তু ঐ যে বললাম, কয়েকজনকে একেবারে শুরুতেই আলাদা ভাবে লক্ষ্য করেছি, আফিয়া আপু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

তারা আফিয়া আপুর সম্পর্কে অনেক ভয়ানক একটা ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে। রাসায়নিক যুদ্ধের সাথে “নিউরোসায়েন্টিস্ট” মানে স্নায়ুবিজ্ঞানীর সম্পর্ক জুড়তে চাওয়া উদ্ভটই শোনায়। হ্যাঁ, ব্র্যান্ডিযের নিউরোসায়েন্স বিভাগের পরিচিতি বিশ্বজোড়া, কিন্তু সেখানে আফিয়া আপু পড়েছেন বিহেভিয়ারাল সায়েন্স নিয়ে। তার পিএইচ.ডি.র বিষয় ছিল “অনুকরণের মাধ্যমে শেখা”

পরে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। দু’জনেই ম্যাসাচুসেটস ছাড়লাম। এরপর কয়েক বছর আর তার কোনো সংবাদ পাইনি। হঠাৎ একবার পাকিস্তান বেড়াতে গিয়ে পত্রিকায় তার অপহরণের বিষয়টা পড়ি। শেখ রশীদ ছিলেন পাকিস্তানের তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি টেলিভিশনে দাবি করলেন আফিয়ার অপহরণের ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই!

ইন্টারনেটে সার্চ করে আমি আফিয়া আপুর দেখা পেলাম আবার৷ সেই পরিচিত প্রিয় চেহারার ছবি সেখানে৷ কিন্তু ছবিতে দেখা যাচ্ছিল FBI এর মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের একজনকে! এ কী করে সম্ভব? তিনি কেন এখানে? তার ছবি দেখার সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়লেই এখনও আমার ভেতরে শিহরণ বয়ে যায়৷ আমার বিশ্বাসই হতে চায় না- তার মতো কেউ এমন কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে৷

২০০৩ সাল, সবেমাত্র দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের মা হয়েছি আমি৷ আফিয়া আপুর ছোট ছেলেটা, তার নাম ছিল সুলাইমান, এখন হয়তো আমার মেয়ের বয়সী হতো৷ সাত বছর৷ বাচ্চাটার পরিণতি কী হয়েছে ভাবতে গেলেই আমি আঁতকে উঠি৷ কী হয়েছে ওর? আজ পর্যন্ত কেউ জানে না!

কেউ আফিয়া আপুরও খোঁজ জানত না অনেক দিন যাবৎ৷ পাঁচ বছর ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন৷ অবশ্য তার পরিবারের বিশ্বাস- এ সময়টায় তাকে মাটির নিচের জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছিল৷ কিন্তু কেন? আফিয়া আপুকে কেন? কী অপরাধ ছিল তার?

তার সাথে যা যা ঘটেছে, তা কি আমাদের যে কারো সাথেই ঘটতে পারত?

অল্প কিছুদিন আগে ম্যানহাটনের একটি আদালত থেকে তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয়েছে৷ ছিয়াশি বছরের কারাদণ্ড৷ ছিয়াশি বছর! কত লম্বা সময় এটা? একশ বছরের চেয়ে একটু কম৷

সেই দিনটা আসার আগেই হয়তো আমরা মারা যাব। ছিয়াশি বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো তাকে শুধু হত্যাচেষ্টার নাম করেই। তাও যেই হত্যাচেষ্টায় তিনি ছাড়া আর কেউ আহতও হয়নি। অথচ যখন তাকে গ্রেফতার দেখানো হলো, আমরা কেউ কেউ ভেবেছিলাম, যাক তিনি এখন আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার আওতায় আছেন। সুবিচার পাবেন তিনি। তার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাই সর্বোচ্চ। কি ভীষণ বোকার হদ্দই না ছিলাম আমরা! ছিয়াশিটা বছর!! সুবহানআল্লাহ। কোনো শিশু নিপীড়নকারী কিংবা নিজের সন্তানকে হত্যা করা কোনো পাষণ্ড বাবাকেও কখনো এমন শাস্তি পেতে হয়েছে কিনা, অনেক খুঁজেছি। পাইনি।

আচ্ছা ধরেই নিলাম তারা যে অভিযোগগুলো এনেছে তিনি সেগুলোতে জড়িত। ধরেই নিলাম। কিন্তু তাই বলে ছি-য়া-শি ব-ছ-র?? যেহেতু তার সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি, তাহলে বাকি থাকে কেবল ‘হত্যাচেষ্টা’। হত্যাও না, হত্যাচেষ্টা। অথচ তার শাস্তি হলো একজন সন্ত্রাসীর চাইতেও বেশি। বড় বড় আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন থেকে তার এই ঘটনাটাও পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। অধ্যায়ের নাম হবে “বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব।”

আফিয়া আপুর আইনজীবী তার নির্জন সেলের বর্ণনা দিয়েছেন। “একটা ছোট্ট কংক্রিটের ঘর। যাতে কোনো আলো নেই। নেই কোনো জানালাও।” তিনি আরও বলেছেন, “ইতিহাসের দিকে পিছু ফিরে একদিন আমরা কথা বলব কেন আফিয়াকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে। উত্তর পাবো, ভয় থেকে। সেই ভয়, যা আমেরিকার সরকারই আরোপ করেছে এবং তারাই একে লালন করছে। এই ভয়ের কারণেই তাকে আরও শাস্তি দিতে চাইবে অনেকেই। স্রেফ ভয় থাকার কারণেই।”

যেই বিচারক তাকে ‘বিচারালয়ে দাঁড়াতে মানসিকভাবে সক্ষম’ বলে ঘোষণা করেছিল, সেই লোকই তাকে কার্সওয়েল কারাগারে পাঠানোর ব্যাপারে জোরাজুরি করেছে। এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। কার্সওয়েল কারাগার। মানসিক শাস্তির একটা কেন্দ্র। ধর্ষণের পর ধর্ষণ, গণধর্ষণের জন্য যার ব্যাপক কুখ্যাতি আছে। অসুস্থ কয়েদিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যেখানে করা হয় চরম অবহেলা। যেখানে শত শত নারী ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মনে পড়ছে ইউসুফ (আ) এর কথা। প্রাচীন মিশরে তার কারাবাসের কথা। প্রাচীন মিশরে তার কারাবাসের কথা। আল্লাহ, তুমি তোমার নবীর ওপর যেমন দয়া ঢেলে দিয়েছিলে সে সময়, আমার আফিয়া আপুর প্রতিও তুমি তেমন করুণাময় হও। ইউসুফ (আ) কে যেমন তার ধৈর্য আর তোমার প্রতি অবিচল ঈমানের কারণে পুরস্কৃত করেছ, আফিয়া আপুর মর্যাদাও তেমনি বাড়িয়ে দাও।

হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন কিভাবে আমি নবী ইউসুফ (আ) আর আফিয়া আপুকে একসাথে তুলনা করছি। বলতে পারেন, আফিয়া আপু কী পরিবেশে আছেন আমি তা দেখিনি। কিংবা তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। হ্যাঁ, আপনাদের কথা সত্য। তবু কেন আমি তাঁদের দু’জনকে একই পাল্লায় আনছি? কারণ যারা তার বিচারপ্রক্রিয়া স্বচক্ষে দেখেছে, আমি তাদের লেখা পড়েছি। সেগুলোতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে। রায়ের সময় আফিয়া আপু কেমন আচরণ করেছিলেন, তা উঠে এসেছে। তিনি বিচারককে ডেকে বলেছিলেন, “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এখানে আর কারো সাধ্য নেই আমার বিরুদ্ধে কোনো রায় দেবে। আপনারা যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট। আল্লাহর রায়ে আমি খুশি, আপনাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই যে, এতে সামান্য চিড় ধরাবেন। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য।”

এসব কথা যে কারো অন্তরকে স্পর্শ করবে। একেবারে খুব গভীরে ছুঁয়ে যাবে তার। তা সে যে ধর্মের, যে দলেরই হোক।

আফিয়া আপু আরও বলেছেন, “যদি আপনারা মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে চান, তাহলে শিশুদেরকে বন্দি করা বন্ধ করুন। নির্দোষ বন্দিদের ছেড়ে দিন। আমার পেছনে আপনাদের শ্রম, অর্থ নষ্ট করা বন্ধ করুন। যে টাকা আমার পেছনে ঢালছেন আপনারা, তা দিয়ে তো পৃথিবীতে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারছেন না। আল্লাহই জানে এত এত টাকা কোথায় যায়, কীসে খরচ হয়। আমি এখানকার এই লোকদেরকেই আমার ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছি। আপনাদের দরকার নেই আমার দুঃখ কমাতে আসার। যেমন আছি তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি জানি- আল্লাহ চেয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করতে, তাই আজ আমি এখানে।”

“আজব জগত” থেকে আসা রায় ঘোষণার পর আফিয়া আপু কুরআনুল কারীম থেকে **সূরা হুজুরাতের ৬ নাম্বার আয়াত** পাঠ করেন,

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো পাপাচারী লোক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।”

এরপর তিনি আদালতে উপস্থিত সবাইকে, আদালতের বাইরে থাকা তার সব সমর্থককে উদ্দেশ্য করে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে আহ্বান জানান। সব উকিলকে, সব সাক্ষীকে এবং বিচারক বারম্যানকে তিনি ক্ষমা করে দেন। সবার প্রতিও আহ্বান জানান তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য।

অথচ বারম্যান যেন ব্যাপারটাকে মজা করার একটা সুযোগ হিসেবে দেখল৷ সে খোঁচা মেরে বলল, “আহ্, আহ্৷ সব আসামীই যদি তোমার মতো ভাবতে পারত! ... নতুন জীবন উপভোগ্য হোক, ডঃ আফিয়া৷”

আফিয়া আপু জঘন্য এক কারাগারে বন্দি৷ তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে- শারীরিক ও মানসিকভাবে৷ আগের তিনি আর এখনকার তিনি- অকল্পনীয়! অকল্পনীয়! অত্যাচারের দাগ তার অসম্ভব সুন্দর মুখটি জুড়ে৷ এতকিছুর পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতে পারছেন! আমাদেরকেও বলছেন ক্ষমা করে দিতে!! এটা জানার পর নিজের টুটাফুটা ইখলাসকে তার ইখলাসের সাথে তুলনা করে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে এসেছে৷

আমার গা ভর্তি অলঙ্কার; চাইলেই আমার ছেলেমেয়েদেরকে চুমু খেতে পারছি; আমার বোনকে জড়িয়ে ধরতে, ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারছি৷ তবুও আমি কত দুর্বল! কত অক্ষম! কেউ আমার বদনাম করলে, কেউ আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটালে তাকে ক্ষমা করতে আমার কষ্ট হয়৷ আচ্ছা, তাহলে আমাদের দু’জনের মধ্যে কে আসলে বেশি ভালো আছে?

আমি চাই আমেরিকানরাও তাকে পাকিস্তানে পাঠানোর দাবিতে একাত্ম হোক৷ তাকে পাকিস্তানে পাঠানো হোক৷ তাহলে অন্তত গরাদের অপর প্রান্ত থেকে তিনি তার ছেলেমেয়েকে দেখে ব্যথাতুর দু’চোখ জুড়াতে পারবেন৷

কতশত লোকই তো তাদের জীবনে দুঃখ দুর্দশায় পড়েন৷ আলিমগণ বলেন যে, এসব বিপদ কি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নাকি শাস্তিস্বরূপ তা বোঝার জন্য বিপদগ্রস্তকে

অবশ্যই মুহাসাবাহ করতে হবে। মুহাসাবাহ মানে হলো নিজেকে প্রশ্ন করা- এই বিপদ কি আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছে?

আদালতে দেওয়া তার বক্তব্য থেকে আমি নিশ্চিতভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আফিয়া আপুর প্রতি এ এক বিশাল পরীক্ষা। বি-শা-ল পরীক্ষা। এমন পরীক্ষা, যেখানে তার ঈমান আছে অবিচল। আর হৃদয়ের প্রশান্তি হিসেবে আছে স্বপ্নে আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর দেখা পাওয়ার সুমহান সৌভাগ্য।

-হেনা জুবেরী

এডিটর ইন চীফ, মুসলিম ম্যাটারস ডট অরগ

সাংবাদিক সিএনবিসি এশিয়া, ইস্টার্ন টেলিভিশন নিউজ

যে আফিয়াকে আমি দেখেছি

আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم এর যুগে নব্য মুসলিমদেরকে দু'টি শ্রেণীতে বিবেচনা করা হতো- যারা নিজেদের অঞ্চলে আর সব মানুষের সাথে থেকে ইসলামের মৌলিক কার্যাবলী পালন করতেন, তারা এক শ্রেণীর। অন্যদিকে যারা রাসূল صلى الله عليه وسلم এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হিজরত করে চলে আসতেন, তারা আরেক শ্রেণীভুক্ত। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রতি মর্যাদার ভিত্তিতে রাসূল صلى الله عليه وسلم এর আচরণও ছিল ভিন্ন। যেমন- মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী صلى الله عليه وسلم যখন কোনো যুদ্ধের জন্য সেনাপতি

নির্ধারণ করে পাঠাতেন, তখন তাকে শত্রুদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করবে তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে তা বলে দিতেন৷ তিনি صلى الله عليه وسلم বলতেন, “... তাদেরকে নিজেদের দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের ভূমিতে হিজরত করতে আহ্বান জানাবে৷ তারা কথামতো কাজ করলে তাদের জানিয়ে দেবে, এর ফলে তারা মুহাজিরগণের শর্তের আওতায় আসবে এবং মুহাজিরদের সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে৷ আর যদি তারা হিজরত না করে, জানিয়ে দেবে যে, তারা তখন বেদুইন হিসেবে অভিহিত হবে৷ এবং তাদের ওপর আল্লাহ তা’আলার সেই হুকুমগুলোই প্রযোজ্য হবে যেগুলো অন্যান্য ঈমানদারদের জন্য প্রযোজ্য হয়৷” এক দলের সাথে অন্য দলের এই পার্থক্যটা কেবল একটি সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল৷ আর তা হলো এক দল নিজেদের কাঁধে কিছু দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল, অন্য দলটি তা নেয়নি৷ আর এই দায়িত্ব না নেওয়াটাই তাদেরকে ব্যক্তিবাদী, সীমাবদ্ধ এবং ঝুঁকিমুক্ত এক ইসলামের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল৷

এক কথায় বলা যায় মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم সে সময়কার মুসলিমদের দ্বীনচর্চাকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন৷ অভিবাসীদের দ্বীন (দ্বীন আল-মুহাজিরীন, যারা ইসলামকে সাহায্য করার এবং একে বিজয়ী করার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবেন) এবং বেদুইনদের দ্বীন (দ্বীন আল-আ’রাব, যারা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোই পালন করবেন)৷

যদিও এই দৃশ্যপট আজ থেকে হাজার বছর আগের, তবুও সব স্থানে সবসময় মুসলিমদেরকে এই শাশ্বত মানদণ্ডের ভিত্তিতেই পরিমাপ করা হয়৷ তাই কি পশ্চিমে আর কি পূর্বে, প্র্যাক্টিসিং (ইসলামের বিধিবিধান পালন করা) মুসলিমদের মধ্যে এই স্বতন্ত্র পার্থক্যটা চোখে পড়বেই৷ সে যুগের দ্বীন আল-আ’রাবকে বলা যায় এমন এক ইসলাম, যা কেবল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পূর্ণ করা, হালাল খাওয়া আর এলাকার মসজিদ পরিষ্কার রাখার কাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ৷ পশ্চিমা দেশে যখন অন্তত এ ধরণের মুসলিম হওয়াই কষ্টকর, তখন আপনি যদি এমন কাউকে পান, যিনি সেখানে আরেক ধাপ

এগিয়ে আছেন, যিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীন আল-মুহাজিরীনের দলে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছেন, তাকে দেখে কি আনন্দে আপনার চোখ ভিজে আসবে না? ভেবে দেখুন কত চমৎকার একজন মুসলিম হলে পশ্চিমের দেশে থেকেও কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং তাঁদের চিন্তার জগত পুরো মুসলিম উম্মাহকে ঘিরে আবর্তিত হয়! তারা অন্যান্যদেরকেও এগিয়ে এসে দ্বীনের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করেন এবং রাতদিন পুরো সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। জীবনের ব্যস্ততার চাপ তাঁদেরকে দমাতে পারে না। অন্য মুসলিমদের সাথে সমান তালে তাঁদের হৃদয় স্পন্দিত হয়। তারা মাথা উঁচু করে বাঁচেন। পশুর মতো কেবল খেয়েদেয়ে যারা জীবন কাটায়, তাদেরকে তারা ভয় করেন না।

তাই বলা হয়,

هكذا الاحرار في دنيا العبيد

“দাসত্বের দুনিয়ায় তারাই মুক্ত স্বাধীন...”

ইদানিং সমগ্র বিশ্বে এমনই একজনকে নিয়ে কথা হচ্ছে। একজন খাটো, শীর্ণদেহী একজন স্ত্রী এবং তিন সন্তানের একজন মা-কে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে খুব। নাম তার আফিয়া সিদ্দিকী।

আমি এই নারীর কাহিনী আপনাদের শোনাতে চাই যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কেন আমি তার ব্যাপারে মনোযোগী। আমি চাই, আপনারা জানুন ইসলামের প্রতি তার দরদ কত গভীর ছিল, কত ত্যাগ ছিল তার ইসলামের জন্য। তার পরিচিতদের বর্ণনামতে তিনি

ইসলামের জন্য খুব অনায়াসেই প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুবই অল্প মানুষই পারবে তা করে দেখাতে।

আফিয়া ছিলেন ছোটখাটো গড়নের, চুপচাপ, বিনয়ী এবং লাজুক এক নারী। ভীড়ের মধ্যে তেমন একটা চোখেই পড়বে না, এমনই ছিল তার গড়ন এবং স্বভাব। কিন্তু যখন প্রয়োজন হতো তখন আফিয়া যা বলা দরকার তা বলতে কখনো কসুর করতেন না। একবার স্থানীয় এক মসজিদে বসনিয়ার ইয়াতিমদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছিল। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় দর্শক সারিতে বসে থাকা পুরুষদেরকে আফিয়া কড়া ভাষায় তিরস্কার করলেন, একজন মেয়ে হয়ে তিনি যা করছেন, পুরুষরা তা কেন করছে না- প্রশ্ন তুলে। শত শত মুসলিম পুরুষ নিয়ে গড়া যে সমাজে ইসলামের কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায় না, সে সমাজের একজন মা, একজন স্ত্রী এবং একজন ছাত্রী হিসেবে আফিয়া সেদিন উচিত কাজটাই করেছিলেন।

এমআইটিতে পড়াকালীন তিনি স্থানীয় জেলখানাগুলোয় বন্দি মুসলিমদের মাঝে কুরআন এবং অন্যান্য ইসলামী বইপত্র বিতরণ শুরু করেন। তার অর্ডার করা বইগুলো একটি মসজিদে এসে পৌঁছুলে তিনি নিজে সেসব বই ভর্তি ভারি ভারি বাক্স নামিয়ে আনতেন মসজিদ থেকে। চিন্তা করা যায়- একজন মহিলা অচেনা, কারাবাসী মুসলিমদের জন্য আনা বইয়ের বাক্স নিয়ে খাঁড়া সিঁড়ি বেয়ে তিন তলা থেকে নেমে আসছে! আর আল্লাহর কি মর্জি দেখুন! সুবহানআল্লাহ!! যেই মেয়েটা মুসলিম কারাবন্দিদের জন্য এত কিছু করলেন, তিনি নিজেই কিনা আজ বন্দি? (দু'আ করি, আল্লাহ তার মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।)

ইসলামের জন্য তার অবদান ভার্সিটি ক্যাম্পাসেও সমভাবে জাজ্বল্যমান। ২০০৪ সালের বোস্টন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তার সম্পর্কে লেখা হয়, "...ইসলামের শিক্ষা প্রচারে ইচ্ছুকদের উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি দিকনির্দেশনা মূলক লেখা রচনা করেছেন। সেই

গ্রুপটির ওয়েবসাইটে আফিয়া সিদ্দিকী ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে একটি দা’ওয়াহ টেবিল পরিচালনা করতে হয়৷ অথবা একটি ইনফরমেশান বুথ, যা কিনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন ইভেন্ট উপলক্ষ্যে খোলা হয়, তার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা যায়৷ তিনি মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কিছু কৌশলও শিখিয়েছেন ওয়েবসাইটের সেই লেখায়৷” ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই নিবন্ধে আরও বলা হয়, আফিয়া তার দিকনির্দেশনা মূলক লেখাগুলোতে লিখেছেন, “সেই দিনটির কথা কল্পনা করুন, যেদিন আমাদের আজকের এই ছোট ছোট কিন্তু আন্তরিক দা’ওয়াহ কার্যক্রম এই দেশে একটি বিশালায়তন দা’ওয়াতী কর্মকাণ্ডে পরিণত হবে৷ একটু চিন্তা করে দেখুন তো, আসছে বছরগুলোতে যতজন ইসলামের ছায়াতলে আসবেন এই কার্যক্রমের ফসল হিসেবে, তাদের প্রত্যেকের সারাজীবনের সমস্ত সাওয়াবের ভাগীদার আমরা হব৷ চিন্তা করে দেখুন তো অবস্থাটা কেমন হবে তখন!! চিন্তা করুন এবং বড় পরিকল্পনা বিনির্মাণ করে এগিয়ে যান৷ আল্লাহ আমাদেরকে সামর্থ্য দান করুন, শক্তি দিন যেন আমরা এই কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে পারি যতদিন না আমেরিকা একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে৷”

আল্লাহু আকবার… দেখুন কত বড় ছিল তার হিম্মত (উচ্চাকাঙ্ক্ষা)… কি তীব্র ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য! পুরুষ হয়ে যদি এক নারীর কাছ থেকে এমন স্বপ্ন দেখা শিখতে হয় তবে তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত৷

প্রতি রবিবারে এলাকার মুসলিম শিশুদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতেন তিনি৷ একজন বোন আমাকে বলেছেন যে, আফিয়া প্রতি সপ্তাহে কিছু নওমুসলিমকে দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও চলে আসতেন৷ তার ক্লাস করতেন এমন এক বোন আফিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, “কেউ তাকে চিনুক বা নতুন কোনো বন্ধু জুটুক এসব কিছু তিনি চাইতেন না৷ তিনি এখানে আসতেন কেবল আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে৷ …অথচ ইংরাজি তার মাতৃভাষাও ছিল না৷”

এইরকম আরেকজন বোন যিনি আফিয়ার ক্লাশে অংশ নিতেন তিনি বলেন, “আফিয়া সবসময় আমাদের বলতেন যেন আমরা কখনো নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে কুণ্ঠাবোধ না করি৷ তিনি বলতেন, “আমেরিকা কখনোই দুর্বলকে শ্রদ্ধা করতে জানে না৷ যদি আমরা উঠে দাঁড়াই এবং শক্তিশালী হই তখন তারা আমাদের ঠিকই সম্মান দিবে৷”

আল্লাহু আকবার!! হে আল্লাহ, বোনটিকে তুমি মুক্ত কর!

অবশ্য আফিয়ার সবচাইতে বেশি আকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো৷ বসনিয়া যুদ্ধ যখন শুরু হলো, আফিয়া তখন অন্যদের মতো নির্বিকার বসে থাকেন নি৷ কল্পনার ডানায় চড়ে বসনিয়ায় হাজির হয়ে সেখানকার মানুষকে উদ্ধার করার স্বপ্ন দেখার মানুষ আফিয়া ছিলেন না৷ বরং তার পক্ষে সম্ভব, এমন সবকিছু করার জন্যই তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন৷ জনসাধারণের সাথে কথা বলে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন, তহবিল সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছেন, স্লাইড শো প্রেজেন্টেশান নির্মাণ করেছেন৷ আমি বলতে চাইছি, আফিয়া আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, চাইলেই আমরা আমাদের ভাইবোনদের জন্য অনেককিছুই করতে পারি৷ নিদেনপক্ষে যারা জানে না, তাদের কাছে সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর নির্যাতনের খবর পৌঁছে দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি৷ হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা কখনোই সুফল বয়ে আনবে না৷

বসনিয়ান ইয়াতিমদের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থানীয় মসজিদে দেওয়া সেই বক্তব্যের মাঝে তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, “আপনাদের কার কার কাছে এক জোড়ার বেশি জুতো আছে?” মসজিদের প্রায় অর্ধেক লোকই তখন হাত তুলল৷ তিনি তখন বললেন, “তাহলে আপনারা এগিয়ে আসুন বসনিয়ার শিশুদের জন্য! যারা একটি

কঠিন শীত পার করতে যাচ্ছে!” তার এই আর্তি এতটাই জোড়ালো ছিল যে, মসজিদের ইমাম পর্যন্ত তার জুতোজোড়া খুলে দান করে দেন।

ইসলামের জন্য তার আবেগ ও ভালোবাসার কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলা যাবে। আর না বলি আপাতত। শুধু এটুকুই বললাম যেন আপনারা অন্তত বুঝতে পারেন মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন আফিয়া এবং আশা করি এই কথাগুলোই আমার ভাইদেরকে অনুপ্রাণিত করবে যতটুকুই সামর্থ্য আছে তা নিয়েই বোনদের আগে দ্বীনের সেবায় এগিয়ে আসতে। মনে রাখবেন, তিনি এতকিছু করেছেন এমন একটা সময়ে যখন তিনি একজন মা, একজন পিএইচ.ডি. গবেষক। অথচ আমরা? আমাদের অধিকাংশই প্রচুর অবসর সময় পেয়েও তার তুলনাই খুবই কম কাজ করছি।

মনের মধ্যে এমন এক আফিয়ার ছবি এঁকে নিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই সেই দিনটিতে, যেদিন তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। যে দিনটি হতে পারত তার জামিনের দিন।

আদালত কক্ষের সম্মুখদিকের বামপাশের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল, উপস্থিত হলো নীল হুইলচেয়ারে বসা হাড্ডিসার, নিস্তেজ ও পরিশ্রান্ত এক নারী। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, নিজের মাথাটা পর্যন্ত সোজা রাখতে পারছিলেন না। তার পরনে ছিল গুয়ান্তানামো কারাবন্দিদের মতো এক রঙা কমলা জামা। জীর্ণ মাথা মোড়ানো ছিল এক সাদা হিজাবে, যার প্রান্তভাগ নেমে এসে ঢেকে রেখেছিল তার অস্থিসার হাত দুটো (কারাগারের ইউনিফর্ম হাফহাতা থাকে)। তার আইনজীবী দ্রুত পাশে এসে বসলেন এরপর শুনানি শুরু হলো।

প্রধান প্রসিকিউটর (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী), সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন তিন-চারজন এফবিআই এজেন্টকে সাথে নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন। তাদের সাথে এক

মহিলাও ছিল যার চেহারা পাকিস্তানিদের মতো (আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক এই দালালের প্রতি)। আফিয়ার করুণ শারীরিক অবস্থার কারণে জামিন শুনানি মুলতবি করার দাবি জানানোর মাধ্যমে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। আফিয়ার আইনজীবী তার এ মুমূর্ষু অবস্থায় জামিন নয় বরং সবকিছুর আগে একজন ডাক্তার দেখানোর জন্য আবেদন জানালেন। লাভিন উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানিয়ে বলল, আফিয়া আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। অবশ্য বিচারক সে কথা তেমন আমলে নিলেন বলে মনে হয়নি। লাভিন বলে চলল, “আফিয়া এমন এক নারী যিনি বন্দি থাকা অবস্থায় বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে।” সঙ্গে সঙ্গে আমি আফিয়ার দিকে তাকালাম। দেখলাম তিনি খুব কষ্ট আর হতাশা নিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে রাখা ভালো, তিনি ছিলেন খুবই ছোটখাটো গড়নের আর তখন তিনি এতটাই নুয়ে ছিলেন যে, আমি কেবল পেছন থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা আফিয়াকে সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। যতটুকু দেখেছি তা হলো, তার মাথা বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হিজাবে তার মাথা মোড়ানো এবং ডান হাত বের হয়ে আছে।

যখন উকিল আফিয়ার অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলেন একের পর এক, তখন আমি আরও ভালোভাবে বুঝতে শুরু করেছিলাম কেন ড. সিদ্দিকী এতটা মনঃকষ্টে জর্জরিত আর ভঙ্গুর হয়ে ছিলেন। কেন এতখানি মুষড়ে পড়েছিলেন। উকিলের তালিকা ছিল নিম্নরূপ-

- আমেরিকার তত্ত্বাবধায়নে থাকাবস্থায়ই তার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায়।

- এই সময়ে তার দেহ থেকে একটি কিডনিও সরিয়ে ফেলা হয়।

- তিনি খাবার হজম করতে পারছেন না, কারন এক অপারেশানের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়।

- তার গুলিবিদ্ধ ক্ষতের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়িয়ে সেলাই করা হয়েছে।

- অপারেশানের ফলে তার পুরো শরীরে অনেকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

এত কিছুর পরে একজন ডাক্তারও দেখানো হয়নি তাকে। আমেরিকার কারাবাসের পুরোটা সময় জুড়ে তাকে এতসব দুঃসহ যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আর আফগানিস্তানে অদক্ষ হাতে করা কর্তব্যজ্ঞানহীন এক অপারেশানের পর থেকে পেটের যে অসহ্য ব্যথা অনবরত তাকে কষ্ট দিয়েছে, সেই ব্যথার জন্য তারা দিয়েছে কেবল আইবুপ্রোফেন। আইবুপ্রোফেন হলো মাথাব্যথা সারানোর ওষুধ!

এসব সত্ত্বেও প্রসিকিউটর আফিয়াকে “রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি” হিসেবে দেখিয়ে তার সব রকমের চিকিৎসা সেবা বন্ধ রেখেছিল। কত নিকৃষ্ট কত নির্লজ্জ সে! বিচারক যখন প্রশ্ন করলেন, কেন তাকে ন্যূনতম চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে দিনের পর দিন নিউইয়র্কের জেলে পুরে রাখা হয়েছে? তখন প্রসিকিউটর তোতলাতে তোতলাতে বললেন যে, ব্যাপারটা “একটু জটিল।” এরপর বেহায়ার মতো নিজেদের দোষ ঢাকতে বললেন, “এটা মিসেস সিদ্দিকীরই সিদ্ধান্ত। তিনি কোনো পুরুষ চিকিৎসকের সামনে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না।” লোকটা তার কথা শেষ করার আগেই আমি দেখলাম আফিয়ার শীর্ণ, দুর্বল এক হাত উঠে গেল ধীরে ধীরে। তিনি বিচারকের দিকে উদ্দেশ্য করে অতিকষ্টে হাতটি আস্তে আস্তে নাড়ছিলেন। যেন বোঝাতে চাইছেন, “না, এই লোক মিথ্যে বলছে। মিথ্যে বলছে।”

তখন আফিয়ার জন্য প্রচন্ড কষ্ট লাগছিল আমার! তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নিয়ে বলা এসব জঘন্য মিথ্যে কিভাবে সহ্য করছিলেন তিনি? সে সময় তার চেহারায় প্রচণ্ড হতাশার ছাপ ফুটে ওঠে৷ আফিয়ার আইনজীবী তখন তার হাতটি ধরে পায়ের উপর বসিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন৷

শুনানি শেষে ইমাম ইবনুল কায়্যিমের একটি কথা আমার মনে পড়ছিল৷ তিনি বলেছেন, একজন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ততক্ষণ অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না শেষ প্রতিবন্ধকটি অবশিষ্ট থাকবে যা থেকে শয়তান তাকে তাড়া করে৷ মানুষকে এই বাধা অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে৷ যদি কেউ এই বাধা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন, তবে তারা ছিলেন নবী-রাসূলগণ এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দারা৷ এই হলো শয়তানের সেই প্রতিবন্ধকতা যাতে শয়তান তার বাহিনী নিয়ে ঈমানদারদের বিভিন্নভাবে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবে৷ ক্ষতি করবে তাদের হাত, জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে৷ এবং এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটি পরীক্ষা৷ ঈমানদারদের অন্তরের বিশুদ্ধতার মাত্রা অনুযায়ী এই পরীক্ষার মাত্রায়ও রকমফের হবে৷ ঈমান যত শক্তিশালী হবে, শয়তান তত বেশি তার বাহিনী লেলিয়ে দেবে এবং তার বাহিনীকে সাহায্য করবে৷ তার অনুসারী এবং মিত্রদের সাহায্যে ঈমানদারকে হতবিহ্বল করে দিতে চাইবে৷ এই বাধাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আল্লাহর পথে বান্দা যত দৃঢ়তার পরিচয় দেবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে যত মনোযোগী হবে, শয়তান তত বেশি মূর্খদের মাধ্যমে তাকে ধোঁকা দিতে তৎপর হবে৷ যে এই বাধার বিপরীতে নিজের শরীরে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নামে ঈমানের বর্ম পরে নিল (অর্থাৎ শত্রুর মোকাবেলা করল), তার এই ইবাদতই হলো সব ইবাদতকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত৷”

সেদিন কোর্টে ইবনুল কায়্যিমের এই কথাটা একদম পরিষ্কারভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল৷ শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হওয়ার পরও আফিয়া যে নিজের সম্মান ও শক্তি ধরে রেখেছিলেন, তা সেদিন পুরোটা সময় জুড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল

এবং ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছি যতবার তার দিকে তাকিয়েছি ততবারই। উপলব্ধি করেছি তার সব কিছুতেই। প্রসিকিউটরের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তার হাত নাড়ানোতে, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝেও কয়েদি পোষাকের ওপর হিজাব পরাতে। উপলব্ধি করেছি যখন দেখলাম পুরো আদালত কক্ষটি লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে এফবিআই এজেন্ট, ইউএস মার্শাল, সাংবাদিক আর কর্মকর্তায়। এরা সবাই শান্ত, ভেঙে পড়া শরীরের, দুর্বল ও খর্বাকৃতির সেই নারীর প্রতি ভয়ার্ত চোখে চেয়ে ছিল! কীসের এত ভয় তাদের? শেষ পর্যন্ত উত্তর পেলাম, তারা কেবলমাত্র আফিয়ার একটা জিনিসকে নিয়ে শঙ্কিত আর ভীতসন্ত্রস্ত আর তা হচ্ছে এই বোনের শক্তিশালী দৃঢ় ঈমান।

আমাদের প্রিয় এই বোন এমনই এক নির্মম পরিস্থিতিতে আছেন। কাফিরদের হাতে বন্দি অবস্থায়।

কী বলার আছে আমার...?

মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করার বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে আমি এই লেখার ইতি টানব না। কিভাবে আল মু'তাসিম কেবল একজন মুসলিম নারীকে বাঁচানোর জন্য পুরো একটি শহর ঘিরে ফেলেছিলেন, আমি সেই কাহিনীও বর্ণনা করব না। হাজার হাজার মুসলিম বন্দিকে উদ্ধার করা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বা উমার বিন আব্দুল আযীযের কথাও বলতে চাচ্ছি না। এগুলো বলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী মানসিকতা এই মুহূর্তে আমার নেই। কারণ আফিয়া যে বন্দি, এর চাইতেও দুঃখজনক হলো, একটি শহরের পাঁচ লক্ষ মুসলিমের মাঝে অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউই সেদিনের শুনানিতে উপস্থিত ছিল না। আমেরিকার একটা মুসলিম সংগঠনও তাদের এই বোনটার জন্য সেদিন দাঁড়ায়নি। তার পক্ষে কেউ একটা বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি।

ইবনুল কাইয়্যিম সত্যিই বলেছিলেন, “... মানুষের অন্তর থেকে যখন গাইরাহ (উম্মাহকে আগলে রাখার প্রবল ঈর্ষা) উঠে যায়, ঈমানও সেই হৃদয় থেকে চলে যেতে থাকে।”

দুর্ভাগ্যবশত, যখন আমরা অধিকাংশই দ্বীন আল-আ’রাবের পথে আছি, তখন আফিয়াকে সাহায্য করার পথ বাতলে দেওয়ার মতো যদি একজন মানুষও থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র আফিয়াই৷ আল্লাহই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী৷

-তারিক মেহান্না

[তারিক মেহান্না আমেরিকার পেনসালভেনিয়াতে জন্ম গ্রহনকারী একজন মুসলিম দা’ঈ, পেশায় ফার্মাসিস্ট৷ তিনি আমেরিকার মুসলিমদের মাঝে অত্যন্ত সম্মানিত এবং পছন্দনীয় একজন ব্যক্তিত্ব৷ তিনি সেখানে দীর্ঘদিন জুমু’আর খুতবা দেওয়ার পাশাপাশি তরুণদের সাথে হালাক্বাহ ও দাওয়াতের কাজ করেছেন৷ আমেরিকার নিষ্ঠুর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার, এবং মুসলিম বন্দিদের অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন এক নিবেদিত কণ্ঠস্বর৷ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, আন্তরিক, স্পষ্টভাষী এবং আপোসহীন এক ব্যক্তিত্ব৷ একজন সচেতন রাজনৈতিক ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এফবিআই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছিল৷ তারিককে গুপ্তচর হবার প্রস্তাব দিয়ে এফবিআই ব্যর্থ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দাঁড় করে এবং তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করে৷ পরবর্তীতে এক প্রহসনমূলক বিচারে ২০১২ সালের ১২ এপ্রিলে তার ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়৷ বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনইসের ম্যারিয়ন শহরে কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সাজা ভোগ করছেন৷ তারিক মেহান্নার ‘কখনও ঝরে যেও না’ নামে একটি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে সীরাত পাবলিকেশন৷]

প্রতক্ষ্যদর্শীর বর্ণনায় আফিয়া সিদ্দিকী

FBI ২০০৩ এর মার্চ থেকে আফিয়া সিদ্দিকী নামে এক পাকিস্তানি নারীকে খুজছে, এই খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুরো দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এর আগে অনেকে আফিয়ার নাম পর্যন্ত শোনেনি। ঠিক কি কারনে FBI আফিয়াকে খুজছে এটা পরিষ্কার ভাবে তারা কখনো বলেনি। ইন্টারনেটে এ নিয়ে নানা রকম অদ্ভুত, চাঞ্চল্যকর ও কাল্পনিক ধারণা ঘুরতে থাকে।

'দ্য লেডি আল-কায়েদা' এর সাথে আরো যুক্ত হলো, তিনজন ছোট্ট বাচ্চা, আগের স্বামী ও নতুন স্বামী। বলা হলো আফিয়া হচ্ছে বিন লাদেনের অনলাইন প্রপাগান্ডা মেশিন। আফ্রিকায় স্বর্ন চুরি থেকে শুরু করে গ্যাসোলিন স্টেশনে হামলার পরিকল্পনা কিছুই যেন বাদ গেলো না। সবখানেই আফিয়াকে টেনে আনা হলো।

২০০৩ সালে এই ঘটনা গুলো সত্যিকারের চায়ের কাপে ঝড় তোলার মতো সংবাদ ছিল। যেন জেমস বন্ডের ভিলেনও তাদের সাথে পেরে উঠছিল না। এমনকি একটি ওয়েবসাইটে The Bible Code নামক বইয়ের তথ্য থেকে দাবি করা হলো, আফিয়া সিদ্দিকীকে যিশু খ্রিস্টের পুনরায় আগমনের আলামত হিসেবে বাইবেলে দেখানো হয়েছে। আশা করি আপনারা সে সময়টার অবস্থা বুঝতে পেরছেন। আমার সামনে সর্বপ্রথম যে সংবাদ আসে তা হচ্ছে "এফবিআই আল-কায়েদার এক মহিলা নেত্রীকে খুজছে।" এটা আসলেই খুব অদ্ভুত ছিল!

সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল তা জানতে আমি আফিয়ার পরিবারের সাথে দেখা করলাম। নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন! হ্যা ঠিকই শুনছেন, আমি আফিয়াকে চিনি। এমনকি তার ভাই,

বোন এবং তাদের মাকে একদশক যাবৎ থেকেই চিনতাম। তারা আমাকে বললো, আফিয়া এবং তার তিন সন্তান আহমেদ, মারিয়াম ও ছয় মাস বয়সী সুলাইমান ২০০৩ এর ৩০ই মার্চ ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর থেকে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুদিন পরে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে, আফিয়াকে গ্রেফতার করে মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মার্কিন সরকার তাদের কাছে আফিয়ার বন্দি থাকার কথা অস্বীকার করে। এরপর পাকিস্তান সরকারও তাকে গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করে বসে।

পাকিস্তান সরকারের গুপ্ত সংস্থাগুলো আফিয়ার পরিবারকে এ ব্যাপারে চুপ থাকতে বলে। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আফিয়া আর তার সন্তানদের শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হবে। এই পরের মাসেই তার পরিবারকে এই বলে হুমকি দেওয়া হয়, তোমরা যদি চুপ থাক তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর তার পরিবার ধরে নেয়, আফিয়া ও তার সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে।

আফিয়াকে এক বছরের বেশি সময় বন্দি করে রাখা হয়। অবশেষে ২০০৪ সালের গ্রীষ্মে এটর্নি জেনারেল এবং FBI এর প্রধান ঘোষণা দেয়, আফিয়া হচ্ছে সেই সাত জঙ্গিদের মধ্যে একজন যারা কিনা আমেরিকার ফেডারেল ইলেকশনে বোমা হামলার পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিল।

এরপরে আফিয়া এবং তার সন্তানেরা বিশ্ববাসীর নজর থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস সংস্থা তাদের তালিকায় আফিয়া ও তার সন্তানদের নাম যুক্ত করে। যাদের কিনা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে সরকার গুম করেছে বলে ধারণা করা হয়। বছর দুয়েক পর বাগরাম থেকে মুক্তি পাওয়া এক বন্দি, সেই কারাগারে বন্দি এক নারীর কথা বলে। যে কিনা আধা–উন্মাদ এবং যাকে আমেরিকান সৈন্যরা পাশবিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করেছে। যার নাম আফিয়া সিদ্দিকী। সে

কয়েদিদের কাছে ‘বাগরামের ভূত’, ‘কয়েদি ৬৫০’ এবং ‘গ্রে লেডি অব বাগরাম বা বাগরামের ধূসর মহিলা’ নামে পরিচিত।

২০০৮ এর শুরুর দিকে, বৃটিশ সাংবাদিক ও দক্ষিন এশীয় মানাবাধিকারকর্মীদের একটি গ্রুপ আফিয়ার অবস্থান ও বাগরামে তার সেল নাম্বার শনাক্ত করতে সক্ষম হন। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট পরিমান প্রমাণাদি পেশ করেন এবং আফিয়া ও তার সন্তানদের মুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা...........

আফগান সরকার কর্তৃক দেওয়া বক্তব্যঃ

১৭ জুলাই ২০০৮। আফগান পুলিশ এক গোপন অভিযানের মাধ্যমে আফিয়া সিদ্দিকী নামের একজন বিদেশী মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। যে কিনা সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছিল। তাকে গজনি প্রদেশের গর্ভনরের বাসভবনের বাইরে বোমা বানানোর তরল পদার্থ কেনার সময় আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে বোমা তৈরির ম্যানুয়াল ও নিউইউর্ক সিটির ম্যাপ জব্দ করা হয়।

এই সময়, কিছু আমেরিকান সৈনিকের সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের একজন আফিয়াকে আত্মঘাতী হামলাকারী ভেবে গুলি করে। এরপর আফগান পুলিশ আফিয়াকে মার্কিন সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়।

একই বক্তব্য দেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এর পরের দিন কিছু মার্কিন সৈন্য ও FBI কর্মকর্তা সেই পুলিশ স্টেশনে যায় এবং আফিয়াকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। এই আলোচোনা চলাকালীন একজন আমেরিকার সৈনিক তার M4 রাইফেল মেঝেতে রাখে। সে জানতো না যে তার পিছনে আফিয়া দাঁড়িয়ে আছে। আফিয়া রাইফেল তুলে নেয় এবং সেফটি লক খুলে কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই আফগানি দোভাষির দিকে দুইবার গুলি ছুড়ে। এর পরে এক মার্কিন সৈন্য তার পিস্তল বের করে আফিয়ার দিকে দুইবার গুলি করে এবং সে (আফিয়া) জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায় এবং চিৎকার করতে থাকে।

সত্য বলতে আফিয়া খুব বেশি তার ঘটনা বলেনি। এই বিষয় নিয়েও নয়। তাকে খুব সীমিত ভাবে তার আইনজীবী ও তার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়েছে। আর এই আগের পাঁচ বছরের ঘটনার কথা তো সবাই ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু কেনো আমি এই অদ্ভুত ঘটনা আপনাদের বলছি?

আমি আফিয়া ও তার পরিবারকে দীর্ঘ এক দশক থেকে চিনি। এই দীর্ঘ সময়ে এরা আমার কাছে আমার পরিবারের মতো হয়ে গেছে। এরা কোনো সন্ত্রাসী পরিবার নয়। বরং তাদের সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত্ব পরিবার বলা যায়। আফিয়া দেড় বছরের মতো বোস্টনে ছিল। এই সময়ে আমি তাকে সপ্তাহে একদিন তার ভাইয়ের বাসায় আসতে দেখতাম। সে মূলত তার পড়ালেখা আর ধর্ম পালন নিয়েই ব্যস্ত থাকত। সে আমার সাথে বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচোনা করত। এ ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে আমাদের মাঝে খুব কম আলোচনা হয়েছিল। ইসলামের জীবন বিধান আর দর্শনের ব্যাপারে সে বলত, ইসলাম হচ্ছে সহানুভুতি, দয়া ও ক্ষমাশীলতার ধর্ম। যার সাথে আমি আমার মায়ের থেকে শোনা ক্যাথলিক ধর্মের মিল পেতাম।

সে বিজ্ঞানের উপর MIT থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে এবং Cognitive Neurology উপর ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটি থেকে P.H.D করে৷ এরপর আফিয়া বিয়ে করে এবং সন্তানের মা হয়৷ বসনিয়ার যুদ্ধে এতিমদেরকে সে আর্থিক সহায়তা করে, স্থানীয় কারাগার গুলোতে কুরআন বিতরন করে৷ আফিয়া মূলত স্থানীয় ধর্মীয় কমিনিউটিতে বেশ সক্রিয় ছিলেন৷ যারা অনান্য ধর্মের ব্যাপার গুলো জানে না, তাদের জন্য আমি খ্রিস্টান ধর্মের উদাহারন দিয়ে বলছি তার কার্যক্রম ছিল মিশনারিদের মতো, সেখানে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদ ছিল না৷

হ্যাঁ, আমি মানছি মানুষ পরিবর্তনশীল৷ হয়ত তার পরিবর্তন হয়েছিল৷ কিন্তু আমার কাছে তার আল-কায়দায় যোগ দেওয়াটা এতটাই অবিশ্বাস্য, যেমনটা অবিশ্বাস্য আমার ক্যাথলিক খ্রিস্টান মায়ের আল-কায়দায় যোগ দেওয়া৷ আবার এটাও হতে পারে, সে আমার সাথে পুরোটা সময় জুড়ে মিথ্যা বলেছে৷ কিন্তু যে তার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলবে সে আমার সাথে একমত হবে যে, আফিয়া যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার অভিনয় করার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর৷

আমি যতদূর আফিয়া আর তার পরিবারকে জানি, আমি এটা নিশ্চিত যে আফিয়া যদি সত্যিকার অর্থে ওসামা বিন লাদেন কিংবা অন্যকারো সাথে কোনো পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকত তাহলে সে অবশ্যই তার মাকে জানাত যে, সে এবং তার সন্তানেরা জীবিত আছে৷ আমিও জানতে পারতাম সে জীবিত আছে৷

আমি আপনাদের কাউকে তার পক্ষে যাবার জন্য বলছি না৷ আমি শুধু মাত্র আপনাদেরকে সরকার যা বলে তা বিশ্বাস করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলছি৷ এই সম্ভাবনা থেকেই যায়, সরকার তার ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে৷ এই সম্ভাবনা উড়িয়ে

দেওয়া যায় না যে আমাদের সরকারের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আফিয়া আর তার সন্তানদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে।

একটু ভাবুন, হ্যাঁ আমি আপনাদের কোনো এক পক্ষে যেতে বলছি। আফিয়া আর তার সন্তানদের ২০০৩ এর মার্চে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কমপক্ষে একজন প্রতক্ষ্যদর্শী তাকে ২০০৬ সালে বাগরামে দেখেছে। তাকে মুক্ত করতে আইনি পদক্ষেপের চাপে, তাকে পাকিস্তানি পোশাক পরিয়ে গজনির রাস্তার ছেড়ে দেওয়া হয়। তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় নানা সরঞ্জাম যাতে করে তাকে ফাঁসানো যায়। সে স্থানীয় ভাষা জানত না, কাজেই খুব সহজেই নাটকের মাধ্যমে তাকে আফগান পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আর প্রচার করতে থাকে গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ভিত্ততে সন্দেহজনক বিদেশী মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আফগান কর্মকর্তারা যা বলছে তা শুধু মুদ্রার একপিঠ। প্রাথমিক ভাবে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হচ্ছে তা আদৌ ঘটেই নি। খুব অভিনব কায়দায় মিথ্যা গুলোকে সাজানো হয়েছে। এটা হয়ত প্রমান করা যাবে অথবা যাবে না। কারন আফিয়ার সাথে মার্কিন সরকারের বিরদ্ধে লড়ার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই।

আমি জজ কিংবা জুরি নই। আমি শুধু মাত্র একজন সাক্ষী।

এন্ড্রু প্রুসেল

আফিয়া ও তার পরিবারের দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবং টেক্সাসের বোস্টনের প্রতিবেশী।

ইসলামে নারীর অধিকার

(এই বক্তব্যটি ড. আফিয়া ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন শহরে দিয়েছিলেন।)

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আচ্ছালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবাইকে।

শুধু এই পৃথিবীরই না, মহাবিশ্বের কোথাও যদি আরো কোনো মানব সমাজ থেকে থাকে তাদের প্রতিও আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছি, একমাত্র ইসলামই নারীকে দিয়েছে মুক্তি, করেছে সুরক্ষিত। আর আমি যে এমন দাবি করছি, তা বড়াই দেখানোর জন্য করছি না, করতে পারছি কারণ আমি বিশ্বাস করি ইসলাম এসেছে মহান ন্যায়বিচারক এবং পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে। নারী এবং পুরুষ উভয়কেই যে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো আর কারো প্রতি পক্ষপাতী আচরণ করতে পারেন না। ইসলামই নারীকে এমন এক উচ্চ আসনে উন্নীত করেছে, যার কোনো তুলনা হয় না।

পশ্চিমা দার্শনিক, সেইন্টদের একটা উদাহরণ দেখাই। তারা নারীদের বলে শয়তানের বাহন। অথচ কুরআন তাদেরকে সম্বোধন করছে “মুহসিনা” (অর্থাৎ শয়তানের বিরুদ্ধে দূর্গ) বলে। তাদের দাবি নারীর কারণেই মানুষকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়েছে, অথচ রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন জান্নাত; জান্নাত হলো নারীর মানে মায়ের পায়ের নিচে। এখানেই শেষ নয়, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তাকে অধিকার আর নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। মানুষের সমস্ত মৌলিক চাহিদা তার জন্য ইসলাম নিশ্চিত করেছে। উত্তরাধিকারী হওয়ার, সম্পদের মালিকানা পাওয়ার, পছন্দসই স্বামী নির্বাচন

করার, মোহরানা পাওয়ার, তালাক নেওয়ার অধিকার একজন নারীর আছে। ইসলাম একজন নারীকে শুধু উপার্জন করার স্বাধীনতাই দেয়নি, উপার্জিত প্রতিটা পয়সা সে চাইলে নিজের কাছে রাখতে পারবে, কেউ কিচ্ছু দাবি করতে পারবে না সেখান থেকে। আর কয়টার কথা বলব? যেদিকেই তাকান, সেদিকেই নারীর অধিকার ইসলামে সুনিশ্চিতভাবে বলা আছে।

আচ্ছা, এই কথাটা এখানে পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভালো, ইসলাম অনুসারে অর্থ উপার্জন কিন্তু নারীর কর্তব্য নয়। তার দায়িত্ব আল্লাহ এবং নিজের পরিবারের প্রতি। আর সে যদি এ কাজটাই ঠিকভাবে করতে পারে, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم জানাচ্ছেন, তাহলে এটাই তার নাযাতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার মানে এই না, একজন নারী তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দাসের মতো খাটবে। অন্তত নবী করীম صلى الله عليه وسلم ও তার সাহাবীদের (রা) শিক্ষা কখনোই এমন না।

একবার এক লোক খলিফা ঊমার (রা) এর কাছে তার স্ত্রীর নামে বিচার দিতে এসেছিল। কিন্তু খলিফার দরজার কাছে এসে সে শুনতে পেল খলিফার স্ত্রী খলিফাকে তিরস্কার করছেন। অথচ ঊমার (রা) এর কণ্ঠ শোনাই যাচ্ছে না! 'বেচারা খলিফাও দেখছি আমার মতো যন্ত্রণায় আছেন' এই কথা ভেবে লোকটি বিচার না দিয়েই চলে যাচ্ছিল। ঊমার (রা) লোকটিকে দেখে ফেললেন এবং ডেকে তার ঘটনা জানতে চাইলেন। সব শোনার পর খলিফা লোকটিকে কী বলেছিলেন জানেন?

বলেছিলেন, "আমার স্ত্রী আমার জন্য রান্নাবান্না করে, আমার কাপড় ধুয়ে দেয়, আমার বাচ্চাদেরকে দুধ পান করায়; যদিও এসব করতে সে বাধ্য না। আর এতে করে আমার কোনো বাবুর্চি, ধোপা বা নার্স নিয়োগ করা লাগছে না। তার চেয়েও বড় কথা ওকে নিয়ে আমি সুখে আছি, ওর জন্যই আমি যিনা থেকে বেঁচে আছি। এসব কারণেই আমি তাকে কখনো কখনো ছাড় দিই এবং আমার পরামর্শ থাকবে তুমিও তা-ই করবে।"

রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

“…তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।’ **(সূরা নিসা, ৪:১৯)**

আরও বলেন,

“…তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বস্তু করো না।’ **(সূরা বাক্কারা, ২:২৩১)**

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ এখানে দায়িত্বের কথা বুঝিয়েছেন! আর বোনেরা আমার, এর মানে এই না আমরা এসব উদাহরণ সামনে এনে পুরুষদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে থাকব। না! আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, একজন নারী একজন অবৈতনিক দাসী নয়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم নারীকে একটি ঘরের রাণী হিসেবে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তার ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে, তাকে দেওয়া হয়েছে সম্মান, নিরাপত্তা আর মর্যাদা। অন্যান্য সমাজ, বিশেষত পশ্চিমারা এসব দেয়নি।

হিজাব মানে নারীকে আবদ্ধ করা নয়। এটা বরং তাকে পট্টি দিয়ে বিচার না করে তার স্বকীয়তা দিয়ে বিচার করতে শেখায়। বইকে তো বিচার করতে হয় এর ভেতরের লেখা দিয়েই, প্রচ্ছদের শিল্পগুণ দেখে না। আমরা যেমন, আমাদেরকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে।

ইসলাম চায় না নারীরা নিজেদেরকে গরুর মতো সারা বিশ্বের সামনে দেখিয়ে বেড়াক।

রাসূল صلى الله عليه وسلم চমৎকার একটা উপসংহার টেনেছেন। তিনি বলেছেন, একজন ধার্মিক নারীই কারো জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। কথাটা খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ। দেখুন, একজন ধনাঢ্য বা (দুনিয়াবি হিসেবে) একজন সফল মহিলার কথা বলা হয়নি। কারণ এসব গুণ দীর্ঘদিন যাবৎ কারো তেমন একটা উপকারে আসবে না।

প্রেম ফিকে হবে, সম্পদ খরচ হয়ে যাবে, সৌন্দর্য মলিন হয়ে যাবে!

এসব গুণাবলি পার্থিব জীবনের তৃপ্তির জন্য, আর ধর্মনিষ্ঠার লক্ষ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। সেকারণেই মহানবী صلى الله عليه وسلم পুরুষদের উপদেশ দিয়েছেন পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিতে। অর্থ-সম্পদশালী না, মার্সিডিজ গাড়ির মালিককে না। এমনকি ডানাকাটা পরীকেও না। কিংবা যে অনেক যৌতুক দিতে রাজি আছে, তাকেও না।

না! ইসলামে একজন নারী সর্বপ্রথম আল্লাহর দাসী, কোনো মানুষের না। এবং আল্লাহর কাছে সে পুরুষের চেয়ে নিচু কেউ নয়। তবে এটা সত্য,

“পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়।” **(সূরা আলে-ইমরান, ৩:৩৬)**

নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা। শারীরিক, মানসিক এবং জৈবিক সব রকম ভাবেই আলাদা। ছেলেরা মেয়েদের চাইতে শক্তিশালী, এটা আমরা দেখতেই পাই। ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। একারণেই আল্লাহও পরিবারের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব তাদের ওপরই দিয়েছেন। তার ওপরই ন্যস্ত হয়েছে দারাজা, তথা পরিবারের নেতৃত্ব। কিন্তু এর ফলে মেয়েদেরকে খাটো করা হয় নি। না! অধিকারের প্রশ্নে নারীপুরুষ সমান, যদিও পুরুষকে নারীর ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবারের দেখাশোনা করার এবং চালিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব, দায়দায়িত্ব এবং ঝুঁকি। এর সাথে কাউকে খাটো করা না করার সম্পর্ক কোথায়? কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

“নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোনো নর বা নারীর আমল বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।” **(সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯৫)**

এবং,

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন।” **(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)**

আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, মর্যাদাবান যার ঈমান বেশি, যার তাকওয়া বেশি। হোক সে নারী বা পুরুষ।

ইতিহাস এমন অনেক নারীর নজিরে পরিপূর্ণ যেখানে দেখা যায় তারা নারী-পুরুষ সবাইকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তারা ধর্মীয় বিধান অনুসারে রায় দিয়েছেন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন। এতসব কিছু তারা বিশ্বকে তাঁদের সক্ষমতা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য করেননি। প্রিয় মুসলিম বোনেরা আমার, আমরা অমুসলিম মেয়েদের মতো না। এই পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করার কিছুই নেই। আমাদের যা করতে হবে, তা হলো, আল্লাহর কাছে প্রমাণ করা। প্রমাণ করা যে, হ্যাঁ, আমরা পারি। আমরা পারি আদর্শ মুসলিম নারী হতে। সাহাবীদের (রা) মতো উঁচুমানের মুসলিমাহ। ‘পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি উচ্চতা’র বা এমন কোনো দিক দিয়ে উঁচু না।

সাহাবাদের শত শত উদাহরণ আমি দিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তা শুনতে গেলে আপনারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। তাই আমি এখন কেবল একটি উদাহরণ দেখাব। আসমা বিনতে ইয়াজিদ। হিজরতের সময়, কিশোরী বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। আর ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল বিশের কাছাকাছি। সেই যুদ্ধে তিনি হত্যা করেন ৯ জন কাফিরকে। কী দিয়ে জানেন? তাঁবুর একটা খুঁটি দিয়ে! মেয়েদের কথা বাদ দিলাম। আমি জানি না কয়জন পুরুষ এমনটা করতে পারবে আজকের যুগে বা যে কোনো যুগেই হোক। শুধু তাই না, তিনি অত্যন্ত বিদুষীও ছিলেন। তিনি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং তাবেঈদের যুগের আমাদের বহু সম্মানিত উলামা সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। আয়েশা, খাদিজা, ফাতিমা, যয়নব, আসমা, উম্মে আম্মারা, উম্মে সালামাহ, উম্মে কুলসুম, উম্মে হাকীম... কত নাম! রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

তারা কারা? তারা সবাই রাসূল صلى الله عليه وسلم এর যুগের প্রাজ্ঞী, শিক্ষিকা, ডাক্তার, নার্স, সমাজসেবিকা, যোদ্ধা এবং অবশ্যই মা, বোন ও স্ত্রী। তাঁদের মতো মানুষের সম্পর্কেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

“আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।” **(সূরা আল মুজাদালাহ, ৫৮:২২)**

আর সাফল্য আমাদের হাতে ধরা দিয়েছিল। আখিরাতের তো বটেই, দুনিয়ার সাফল্যও। হযরত মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم এর পর মাত্র ত্রিশ বছরেই ইসলাম ছড়িয়েছে আফ্রিকায়, ভারতে। পৌঁছে গেছে স্পেন পর্যন্ত। তিন তিনটি মহাদেশে! এখন আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, কেন আজ আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর তালিকায়? আমাদের প্রতি যে সম্মান আর শ্রদ্ধা ছিল সবার, তা আমরা হারালাম কেন? আমরা কোনো কাজের জন্য কারো কাছে আজ কৈফিয়ত দিই? কার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি? অবিশ্বাসীদের কাছে, কুফফারদের কাছে। আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো বীর সন্তানেরা আজ কোথায়? কারণ সেরকম বীর জন্ম দেওয়ার মতো, ফাতিমা এবং যয়নবের মতো মা এই উম্মাহর নেই।

আর এমন মা আমাদের নেই কেন? আসুন এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখি…

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম,

কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে।’ **(সূরা আত তাহরীম, ৬৬:৬)**

হে বিশ্বাসীরা, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।

আল্লাহ সীমালঙ্ঘন পছন্দ করেন না, বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না ... কিছু লোক আছে যারা এখনও তাদের অধীনস্থ নারীদের জীবন্ত কবর দেয়! হ্যাঁ, জীবন্ত। তফাৎটা এই, তারা কবরস্থ করে মানসিকভাবে। তারা বলে মেয়েরা পুরুষের দাসী, থার্ড ক্লাস দাসী। আর আল্লাহ মাফ করুক, তারা এসব বলে সুন্নাহর দোহাই দিয়ে! সুন্নাহ? কার সুন্নাহ তারা অনুসরণ করছে?

এটা তো রাসূল صلى الله عليه وسلم এর সুন্নাহ অবশ্যই না। সুন্নাহ কী? রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم নিজের ছেঁড়া জুতা নিজে সেলাই করতেন। স্ত্রী আয়েশা (রা) এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন আর তাতে ইচ্ছে করে হেরে যেতেন। হেরে যেতেন, যেন আয়েশা (রা) মনে কষ্ট না পান।

এই চরমপন্থী ভাই বোনেরা ইসলাম থেকে অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। শুধু নারীদেরকেই না, পুরুষদেরকেও। শুধু কাফির-দেরকেই না, মুসলিমদেরকেও।

এক লোক একবার ইসমাঈল আল ফারুকীর কাছে এল। বলল, তার কাছে ইসলামকে খুবই একপেশে ধর্মের মতো লাগে। যখনই সে কোনো মসজিদ বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়, সেখানে শুধু পুরুষদেরই দেখে। তার প্রশ্ন ছিল, “মহিলারা কোথায়?”। দারুণ প্রশ্ন। আমিও জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাদের মেয়েরা কোথায়?

এখন যে কারো পক্ষেই কোনো মহিলাকে এসে ইসলামের নাম দিয়ে যা তা বলে বুঝ দেওয়া সম্ভব। আর এমন অবস্থায় সেই হতভাগী মহিলা কী-ই বা বলতে পারে? “হ্যা, ঠিকই বলেছেন!” আমার বিশ্বাস, সে মাথা নেড়ে এটাই বলবে। সে জানে না তো কিছু। জানবে কোত্থেকে? তার “মৌলিক অধিকার” না বলে বরং বলব তার শিক্ষিত হওয়ার দায়িত্ব, ইসলামিক এবং সেক্যুলার উভয় শিক্ষাই, তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে কী হলো? ভাইয়েরা, বোনেরা। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়ে আমরা এখন কী দেখছি?

যদি ইসলাম সম্পর্কে কোনো নারীর জ্ঞান থাকে জোড়াতালি গোছের কিংবা অমুসলিমদের ধারণা সে লালন করে অথবা তার চারপাশের দুনিয়া সম্বন্ধে তার কোনো খবরই না থাকে, তাহলে সে কি পারবে তার সন্তানকে নিখুঁত মুসলিমের আদলে গড়ে তুলতে?

কক্ষনো না! একজন শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচটা বছর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী মানুষের ব্রেন শুধু মাতৃগর্ভেই গড়ে ওঠে না। এর পরিপূর্ণতা পেতে পাঁচ বছর লেগে যায়। আর এই পাঁচ বছরে শিশু তার চারপাশে যা কিছু দেখবে, শুনবে; তার বাবা-মা’কে যা কিছু করতে দেখবে সেসবের প্রভাব পড়বে তার ভবিষ্যৎ আচার আচরণের ওপর। যদি কোনো মা নিজে একজন আদর্শ মুসলিমাহ হন, বাবা হন আদর্শ মুসলিম পুরুষ, তখন বাচ্চাটাও আদর্শ মুসলিম না হয়ে যাবে কোথায়?

কিন্তু একজন মা যদি নিজেকে অন্ধকার ঘরের অন্ধকার কোণে আটকে রাখেন, সবসময় থাকেন বাইরের পৃথিবী থেকে নিভৃতে তাহলে তার কাছ থেকে কীই বা আর আশা করা যায়? প্রজন্মের এই ফাটল কোত্থেকে এল? আর কেন মুসলিম বিশ্বে এত

এত অনৈসলামিক রীতিনীতি ছড়িয়ে পড়ছে? এমন অনেকগুলো রীতির একটি হলো, যৌতুক প্রথা। যৌতুক, একটু আগে নাটিকাতে আপনারা যেমনটা দেখলেন, ভারত-পাকিস্তানে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের সময় মেয়েকে নিজের সাথে করে প্রচুর টাকাপয়সা, ফার্নিচার সহ আরও আরও অনেককিছু শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়, এটাই যৌতুক। এটা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী একটা চর্চা। আর এই যৌতুক দিতে পারবে না বলেই কত ভালো ভালো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না।আবার যাদের বিয়ে হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা সেই বিয়েতে রাজি ছিল কিনা সেটাই জানতে চাওয়া হয়নি। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! জবরদস্তি করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।" **(সূরা আন-নিসা, ৪:১৯)**

আর যদি মেয়েগুলোর বিয়ে হয়, আল্লাহ মাফ করুক, যদি মেয়েগুলোর বিয়ে হয় কোনো পাষণ্ড লোকের সাথে, তাহলে সেই লোকের অত্যাচার সে সহ্য করে যায় আজীবন। কারণ মেয়েরা জানেই না বিয়ের সময় কাবিননামায় পাত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে, এমন চুক্তিও লিখে দেওয়া যায়। আমি ভুল বলে থাকলে জামাল বাদাউয়ি ভাই শুধরে দেবেন প্লিজ। (দর্শক সারিতে বসা ড. জামাল বাদাউয়ি আফিয়া সিদ্দিকীর কথায় সম্মতি জানালেন) হ্যাঁ, আপনি বললেন আমি ঠিক বলেছি। (ড. বাদাউয়ি এসময় বললেন, আরও ব্যাপার আছে।) হ্যাঁ, আরও আছে! অবশ্য সমস্যা হলো এতকিছু নিয়ে বলার সময় পাব না। যাই হোক, এটি অন্তত একটি।

কিছু গোঁড়া পরিবার আছে, যদি কোনো মেয়ে বলতে চায় তার বিয়ের শর্তে কী কী থাকবে, পরিবারগুলো তখন মেয়েটার অবস্থা নাজেহাল করে ছাড়ে। মেয়েটার গায়ে

“নির্লজ্জ” তকমা লাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া কোনো মেয়ের তালাক হলে কেন সমাজ তাকে খারাপ চোখে দেখে? যেখানে ইসলাম এমনটা করে না, আল্লাহ তা’আলা করেন না!! কুরআনে আল্লাহ কার্যত রাসূল صلى الله عليه وسلم এর স্ত্রীদেরকে (যখন তারা মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم কে মুখের কথায় কষ্ট দিচ্ছিলেন) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যদি তোমরা অনুতপ্ত না হও, তাহলে আমি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করব এমন নারীদের, যারা তোমাদের চাইতে উত্তম হবে। যাদের আগে বিয়ে হয়েছিল। যারা এখনও কুমারী আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি, পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় আমি ইউনাইটেড ইসলামিক অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টের সাথে দু’বছর কাজ করেছি। তিনি আগামী সপ্তাহে আসবেন আমেরিকায়। আপনারা তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। তিনিই আপনাদের জানাবেন প্রতিদিন কতশত মহিলা এসব অনৈসলামিক আচার ব্যবস্থার বলি হয়ে অভিযোগ করতে আসে। আর যখন আমি “অনৈসলামিক আচার ব্যবস্থা” কথাটা বলছি, বুঝে নেবেন, আমি এখানে পশ্চিমা সমাজের ডেটিংয়ের রীতিসহ আরও যা কিছু আছে সবগুলোকেই যুক্ত করছি। সবকিছুকেই।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, একে এখনই বন্ধ করতে হবে। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। মুসলিম হিসেবে আমাদের লক্ষ্য কী? আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদাত করা। এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ এখন এত বেশি কেন? এই অবস্থা শীঘ্রই বদলাতে হবে।

“যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?” **(সূরা হাদীদ, ৫৭:১৬)**

হ্যাঁ, সেই সময় এসেছে। এবং তা এখনই। সময় হয়েছে আমাদের একত্র হওয়ার এবং এই সমস্যগুলোর সমাধানে কাজ করার। আমরা কেউ যেন মনে না করি –'পারব না'। পারব। আমরা পরিবর্তন আনতে পারব, যদি আমাদের নিয়ত শুদ্ধ থাকে। এটা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম। আল্লাহ বলেছেন,

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।' **(সূরা আনকাবূত, ২৯:৬৯)**

আল্লাহই আমাদের জন্য পথ সহজ করে দেবেন। আল্লাহ তো তাদের সাথেই আছেন, যারা ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, যারা 'মুহসিনীন'।

তাই আসুন, আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক যা কিছুই ইসলামের বিপক্ষে যায় সেগুলোকে পরিহার করি। শুরু করি ইসলামের পথে হাঁটা। ওয়ামা 'আলাইনা ইল্লাল বালাগ, আল্লাহর বাণী প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

আদালতের বিজয় পুরো দুনিয়ার পরাজয়

আফিয়ার এই অদ্ভুত মামলার ব্যাপারে শুরু থেকেই আমরা (John T. Floyd Law Firm) কৌতুহলি ছিলাম। আমরা পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছি আমরা আসলে জানি না সে কি আদতে মেধাবি নিউরোসাইনটিস্ট নাকি আল-কায়েদার নেত্রী, যেমন টা

আমদের মার্কিন সরকার দাবি করে। আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের সরকার আফিয়ার সিদ্দিকীর মামলার ব্যাপারে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে গোপনীয় কিছু লুকাতে চেস্টা করেছে। মার্কিন সরকারের আচারণ থেকে প্রতীয়মান হয় আফিয়া সিদ্দিকী ও তার সন্তানদের গুম করা হয়। অপহরণের কাজটি করেছিল পাকিস্তানি গুপ্তসংস্থা এবং তাকে মার্কিন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মার্কিনীরা আফিয়াকে বাগরামের সামরিক কারাগারে বন্দি করে রাখে। বাগরামে তার উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন চালানো হয়।

ইউএস জেলা জজ রিচার্ড এম বারম্যান কর্তৃক আমেরিকান সৈন্যকে গুলি করার অভিযোগে আফিয়াকে ৮৬ বছরের সাজা শোনানোর পরের মাসেই WikiLeaks একটি নথি প্রকাশ করে। পাকিস্তানের ইউএস দূতাবাসের এক সূত্র, আফিয়াকে ৫ বছর ধরে বাগরামে আটকে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করে বলে "বাগরাম কর্তৃপক্ষ আমাদের নিশ্চিত করেছে তারা আফিয়াকে ৫ বছর যাবৎ বন্দি করে রাখে নি।" ২০১০ এর শুরুর দিকে আফিয়ার সাজা নিয়ে দুনিয়াব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হলে তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অ্যানা প্যাটারসন একে মিডিয়ার একপেশে ভুমিকার ফল হিসেবে উল্লেখ করেন।

২০০৩ সালে করাচি থেকে আফিয়া সিদ্দিকীর নিখোঁজের সংবাদ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোড়ন তোলে যখন, বাগরাম থেকে পালিয়ে আসা চারজন বন্দি Peace Thru Justice Foundation কে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ননা করে। তারা সেখানে একজন পাকিস্তানি নারী বন্দির ব্যাপারে বলে, যে কিনা আমেরিকান সৈন্যদের হাতে পাষবিক নির্যাতনের স্বীকার। সেখানে তাকে কয়েদি ৬৫০ নামে ডাকা হতো। ব্রিটিশ নাগরিক বিনিয়াম মুহাম্মদ আমেরিকার গোপন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আফিয়ার ছবি দেখে একে কয়েদি ৬৫০ বলে চিহ্নিত করেন। কয়েদি ৬৫০ অর্থাৎ আফিয়া সিদ্দিকীর ঘটনা সামনে তুলে আনেন বৃটিশ সাংবাদিক ইভন রিডলি। তিনি তার নাম দেন "গ্রে লেডি

অব বাগরাম।” ইভন রিডলি’র মতে গ্রে লেডি অব বাগরাম বলার কারন হচ্ছে, যারাই প্রিজনার ৬৫০ কে দেখেছে, তারা সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। তার সেল থেকে আমেরিকানদের নির্যাতনের ফলে ভয়ংকর চিৎকার ভেসে আসত।

ফেব্রুয়ারিতে আফিয়ার বিচারকার্য চলার সময় আদালত আফিয়ার দীর্ঘ পাঁচ বছর নিখোঁজ থাকাকে ‘অফ লিমিট’ হিসেবে বর্ননা করেছিলেন কেন? আমরা মনে করি সরকার এই পাঁচ বছর তার সাথে যা করেছে এটা লুকাতে চাচ্ছে। ঘটনাবহুল এই পাঁচ বছরে আফিয়া কি আসলেই বাগরামে নির্যাতিত হয়েছে কি হয়নি এটা আসল কথা না। আসল কথা হচ্ছে দুনিয়া কি বিশ্বাস করে? পাকিস্তানের মানুষ কি বলে? মাঝে মাঝে উপলবদ্ধি বাস্তবতার চেয়ে শক্তিশালী হয়।

আমাদের কি চিন্তা করা উচিত নয়, পাকিস্তানের মানুষ আমেরিকার ব্যাপারে কি ভাবে? হ্যা, অবশ্যই যতক্ষন আমরা কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সহায়তায় নামে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ সহায়তা করছি, ততক্ষন অবশ্যই তাদের সাধারন জনগনের চিন্তা চেতনার ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে। আফিয়া সিদ্দিকীর ঘটনা আমাদের সাথে পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামরিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

আমেরিকার সাধারন জনগন কখনোই জানতে পারবে না বুশের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র নামে করা অনৈতিক, অসৎ ও অবৈধ কাজের ব্যাপারে। বুশের ঘোষিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র সূচনা হয়েছিল ৯/১১ সেই সন্ত্রাসী হামলার পর। যেখানে আমরা ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ও জানমালের ক্ষতির স্বীকার হয়েছি। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’র নামে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হতে হচ্ছে একই সাথে তা আমাদের দেশের অর্থনীতির উপরেও প্রভাব ফেলছে। এই বিষয়টা আরেকটু পরিস্কার করার জন্য আরেকটি উদাহারন সামনে

আনা যেতে পারে, House Veterans Affairs Committee সম্পতি এক রিপোর্টে বলেছে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফেরত আসা আহত সৈন্যদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যয় হবে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ৯/১১ এর পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আমেরিকার সারা বিশ্বের সামনে আগ্রাসী ও বিদেশী শত্রু হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। অনেক তরুণরা ভাবে আমেরিকা গণতন্ত্রের নামে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করছে। সারা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ আমেরিকাকে ঘৃনা করে এবং থুথু দেয়।

শুধু মাত্র পাকিস্তানেই ড্রোন হামলা করে আমরা আরো বিশাল পরিমান যোদ্ধা কিংবা জঙ্গিদের সৃষ্টি করছি। ২০০৪ সাল থেকে এই ড্রোন হামলা শুরু হয়। The New America Foundation এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০ সালেই ১০৩ টি হামলা পরিচালনা করা হয়। শত শত নিরীহ পাকিস্তানি নাগরিক এই হামলায় মারা যায়। পাকিস্তানি সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৪৪ টি ড্রোন হামলায় ৭০৮ জন নিরীহ পাকিস্তানি নাগরিক মারা যায়। আর এর মধ্যে শুধু মাত্র ৫টি ড্রোন আল-কায়েদা ও তালেবান জঙ্গিদের আঘাত হানতে সক্ষম হয়। এর মানে দাঁড়াচ্ছে ১৪০ সাধারন নাগরিককে আমেরিকার হাতে এজন্য মরতে হয়েছে যাতে আমেরিকা একজন আল-কায়েদা ও তালেবান জঙ্গি হত্যা করতে পারে।

আর এই বিশাল পরিমান নিরীহ জনগন হত্যার ফলে আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের জনগনের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আফিয়া সিদ্দিকীর ঘটনায়। একজন নারী যার উপরে আমেরিকান সৈন্যরা নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে তাকে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে ফেলেছে বলেই অনেকের বিশ্বাস। আফিয়া এখন আমেরিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের মাঝে গলার কাটা হয়ে দাড়িয়েছে। সত্য বলতে আমরা কখনোই পাকিস্তানের জনগনের আস্থা অর্জনের আভাসও পাইনি। তার উপর ‘মরার উপর খাড়ার ঘা’ হিসেবে ‘গ্রে লেডি অফ বাগরাম’ যে কিনা ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ন্যাশনাল আইকন হয়ে দাড়িয়েছে, তাকে আমরা আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য

হুমকি স্বরূপ আখ্যা দিয়ে নির্যাতন চালিয়ে জেলে বন্দি করে রেখেছি। সু-সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে আমাদের সরকারের উচিত ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে তার সমর্থক, তার পরিবার, তার নির্যাতনের স্বীকার হওয়া সন্তানসহ দেশে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি আমাদের সরকার ১০ রাশিয়ান গোয়েন্দাকে আমাদের ৪ জন সৈন্যের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারে, তাহলে আফিয়াকে কেনো পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে পারবে না?

মোদ্দাকথা হচ্ছে, ড. আফিয়া সিদ্দিকী একজন আমেরিকান সৈন্যকেও হত্যা করেনি। উল্টো আমরা আল-কায়েদা ও তালেবান জঙ্গিদের হত্যার নামে হাজার হাজার নিরীহ পাকিস্তানিকে হত্যা করেছি যারা কিনা আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য কোনো মাথাব্যথার কারন ছিল না। কেননা তারা নিজেরাই পাকিস্তানের পাহাড়গুলোতে লুকিয়ে ছিল। পাকিস্তানি সরকার যে পরিমান রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের যে পরিমান দূর্নাম হয়েছে তা আফিয়া সিদ্দিকীকে তার বাকি জীবন কারাগারে রাখার চাইতে অনেক বেশি।

জন ফ্লয়াড ও বিলি সিনক্লায়ির

ক্রিমিনাল জাস্টিস এর্টনী, হিউস্টন, টেক্সাস

০৫/১২/২০১০

গোপন অডিও রেকর্ড ফাঁস

২০০৩ সালে MIT থেকে পাশ করা শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ন ড. আফিয়া সিদ্দিকী পাকিস্তানে তার তিন সন্তান সহ নিখোঁজ হন। আসলে কি হয়েছিল তার? আমেরিকানদের দাবি অনুযায়ী, সে কি আল-কায়েদার প্রশিক্ষন শিবিরে ছিল? ২০০৮ সালে তাকে আন্ডারকভার যোদ্ধা হিসেবে বিপুল পরিমান বিস্ফোরক দ্রব্যসহ আমেরিকায় হামলা করার জন্য প্রেরন করা হয় এবং পরবর্তিতে সে এক আমেরিকান সৈন্যকে গুলি করে? নাকি তার পরিবার এবং অধিকাংশ মানুষের দাবি অনুযায়ী তাকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা এক কোনো অজানা কারনে গুম করে?

আফিয়ার অপহরণ রহস্যের ব্যাপারে সব থেকে ভয়ানক রহস্য উন্মোচিত হয়েছে যা কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবিচারের মুখোশ দুনিয়ার সামনে খুলে দিয়েছে। একই সাথে এটা মোটা দাগে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতা ও অদূরদর্শিতা ফুটিয়ে তুলেছে, যা কিনা তাদের নিজেদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে নিউইয়র্ক আদালত আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈন্যকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেয়। তার নিখোঁজ হওয়া এরপর ২০০৮ সালে আফগানিস্তানে হঠাৎ করে উদয় হওয়া, পরবর্তীতে আমেরিকায় এনে তাকে সাজা দেওয়া এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয়। আফিয়ার এই ঘটনা পুরো মুসলিম বিশ্বে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কিছুদিন আগে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক উচ্চপদস্থ কর্মকতা দাবি করেছেন, যেদিন আফিয়া নিখোঁজ হয় সেদিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন আফিয়াকে তার ৩ সন্তানসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর হাতে তুলে দেয়।

আফিয়া নিখোঁজ হবার অল্প সময় আগেই FBI তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে এলার্ট জারি করে। এরপরে তাকে আল-কায়েদার আন্ডারকভার এজেন্ট হিসেবে আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে রাখা হয়। ২০০৪ সালে মার্কিন এর্টনী জেনারেল

জন এশক্রোফট বলেন, “সে পরিস্কার ভাবে আমেরিকার জন্য হুমকিস্বরূপ।” এর পুরো সময় জুড়েই পাকিস্তান সরকার আফিয়াকে গ্রেপ্তার করার বন্দি রাখার কথা অস্বীকার করে এবং ২০০৮ সালে আফগানিস্তানে বন্দি হবার পর থেকে তার বিচারকার্যে মার্কিন আইনজীবিদের পিছনে ২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। তার দন্ডাদেশের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (সাবেক) ইউসুফ রাজা গিলানী ওয়াদা করেন যে, তিনি আফিয়াকে মুক্ত করার জন্য কাজ করে যাবেন। আফিয়া সিদ্দিকী “জাতির কন্যা” হয়ে ওঠে যার ফলে এই বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সদ্য প্রকাশিত একটি গোপন অডিও রেকর্ড পাকিস্তানের রাজনৈতিক ময়দানকে নাড়িয়ে দেয়। যেখানে আমেরিকার প্রতি ক্রোধের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়, বিশেষ করে পাকিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে ড্রোন হামলায় সাধারন জনগন নিহত হবার ব্যাপারে। ইতোমধ্যেই আফিয়া সিদ্দিকীর ব্যাপারে হাজার হাজার লোক আমেরিকার বিপক্ষে রাস্তায় বিক্ষোভ করে যাচ্ছে। আমেরিকা আফিয়ার সিদ্দিকীর সাথে যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে তার ফলস্বরূপ পাকিস্তানের সাধারন মানুষ আমেরিকার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম বরাবরের মতোই সব সময় বলে এসেছে আফিয়ার নিখোঁজ হবার ব্যাপারে আইএসআই দায়ী এবং আমেরিকাও এর সাথে জড়িত। এই টেপ শুধু আফিয়া সিদ্দিকীর ব্যাপারেই নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়নি বরং কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সামরিক ও অন্যান্য চুক্তির (যেমন, তথ্য আদান প্রাদান) উপরও প্রভাব ফেলেছে। কেননা এই চুক্তির বলি হয়েছে বহু সংখ্যক পাকিস্তানি। সেই সেভিয়েত যুদ্ধের সময় থেকেই আইএসআই মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে আসছে। এরপর তারা ধীরে ধীরে পাকিস্তানের বিভিন্ন গোত্রদের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা গডফাদার হয়ে উঠে। পাকিস্তানের অনেক বিচক্ষন সাংবাদিকই এই টেপের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা সংস্থা ও সরকারকে নাকানি চুবানি খাইয়েছে।

আফিয়া আর তার সন্তানদের সাথে কি হয়েছিল এবং প্রকাশ্যে আনার আগের ৫ বছর তাদের উপর কি পরিমান শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল তার জবাব খুঁজতে অবশ্যই অনেক বেগ পেতে হবে৷ এটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বুশ আর ওবামা প্রশাসন এটা জানত না যে, তাদের বন্ধু পাকিস্তান আফিয়া আর সন্তানদের সাথে কি করেছে৷

২১ এপ্রিল ২০০৩ সালে মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক উর্ধতন কর্মকর্তা লিসা মেয়ার্স NBC Nightly News কে বলেন, আফিয়া পাকিস্তানের কাছে বন্দি আছে৷ এর পরেই দিনই কোনো রকম কারন না দেখিয়ে এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়৷ সেই সময়ের মেয়র Harpers Magazine কে বলেন, আমরা মনে করি সে সম্ভবত বোকার মতো কথা বলেছে৷

সংবাদ মাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুইজন উর্ধতন কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে এই কথা স্বীকার করেন যে, ৩১ বছর বয়সী আফিয়া সিদ্দিকীকে সম্প্রীতি পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে৷ পরবর্তিতে তারা তাদের ভাষ্য বদলান এবং বলেন পাকিস্তান সরকার থেকে আসা নতুন তথ্য মতে এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না আফিয়া তাদের জিম্মায় আছে কিনা!

এফবিআই এর এক মুখপাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, আফিয়া তাদের জিম্মায় নেই এবং তাদের এটাও জানা নেই আফিয়া অন্য কোনো দেশের কারাগারে আছে কিনা৷৷

ড. আফিয়া সিদ্দিকী নিখোঁজের কয়েক ঘন্টা পর একজন অপরিচিত ব্যক্তি আফিয়ার মায়ের কাছে আসে এবং তাকে হুমকি প্রদান করে বলেন, যদি আফিয়া ও তার

সন্তানদের আবার দেখতে চায় তাহলে সে যেন তার মুখ বন্ধ রাখে। ২০০৩ সালে এফবিআই এর অভ্যন্তরীণ শুনানির জন্য আফিয়া সিদ্দিকীর বোনের থেকে কিছু ডকুমেন্ট আনতে গিয়ে এফবিআই এর এক কর্মকর্তা তাকে জানায় আফিয়া জীবিত এবং সুস্থ আছে। কিন্তু সে তার নিখোঁজ হবার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

নতুন অডিও রেকর্ডটি গোপনীয়তার সাথে রেকর্ড করা হয়, এটা গতবছরে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে রেকর্ড করা। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাচ্চাদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এটা স্বেচ্ছায় একজন ড. আফিয়া সিদ্দিকীর উকিলকে দিয়েছিল। সেই ব্যক্তির পরিচয় গোঁপন রাখা হয়। সেই ব্যক্তি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে সন্ধ্যার পর এটা রেকর্ড করেছে। যখন সে পাকিস্তানে কাউন্টার টেরিজম, জাল প্রমাণাদি এবং আফিয়া সিদ্দিকীর ব্যাপারে ভয়ংকর কথা শুনতে পায় তখন সে এটা রেকর্ড করে। সেই অনুষ্ঠানে খুব সহজ ভাবেই আফিয়া সিদ্দিকীর নিখোঁজ হবার ব্যাপারে পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসাররা কথা বলছিল। আলোচনা শুনে সেই ব্যক্তি খুব ক্ষুব্ধ হয়ে যায় একটি রেকর্ডার এনে কিছু কথা রেকর্ড করতে সক্ষম হয়। “এটা যদি কারো কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমাকে তা প্রকাশ করতে হবে” ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্কের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর টিনা ফস্টারকে এ কথা বলেন সেই ব্যক্তি।

ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্ক মূলত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মামলাগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তারা বাগরাম এয়ার বেস, আবু গারিব, দুবাই এবং থাইল্যান্ডে সিআইএ এর হাতে বন্দি, যারা একই ভাবে পাকিস্তান থেকে নিখোঁজ হয়েছিল তাদেরকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে।

সেই টেপ রেকর্ডকারী ব্যক্তি একজন পাকিস্তানি অথবা আমেরিকান। তার সাক্ষাৎকার ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্কের এক আইনজীবী নিয়েছিলেন। সেই আইনজীবি আমাকে জানান তিনি এই টেপের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত এবং এর সোর্স বিশ্বস্ত।

ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্কের সূত্র আমাকে জানায় রেকর্ডকারী ব্যক্তি অনুষ্ঠানের আয়োজনকারীকে ইমরান সাখাওয়াত হিসেবে চিহ্নিত করেন, যিনি সিন্ধু প্রদেশের পুলিশ পরিদর্শক ও তার বন্ধু। পাঞ্জাবি, ইংরেজি, উর্দু ভাষার চার ঘন্টার টেপসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্ক সেই প্রত্যক্ষদর্শির অনুমতি সাপেক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ করে। রেকর্ডিং এ শোনা যায়,

মিঃ শওকত (টেপের ১ম ব্যক্তি): আমি তখন করাচিতে ছিলাম। আমি সিন্ধু প্রদেশের কাউন্টার টেরোজম ইউনিটের প্রধান ছিলাম।

টেপে শোনা যায় আরেক ব্যক্তি মিঃ শওকতকে আফিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে।

২য় ব্যক্তি : আপনি কি তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন?

মিঃ শওকত : হ্যাঁ, আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছিলাম। সে চশমা ও বোরকা পরিহিত অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে ইসলামাবাদ যাচ্ছিল।

২য় ব্যক্তি : তারপর কি হলো? আইএসআই কি তাকে তাদের জিম্মায় দিয়ে দিতে বলল?

মিঃ শওকত : হ্যাঁ, আমরা তাকে আইএসআই'র হাতে তুলে দিই।

২য় ব্যক্তি : আইএসআই ছিল? নাকি অন্য কেউ?

মিঃ শওকত : হুম, আইএসআই। আমরা আফিয়াকে তাদের হাতে তুলে দিই। সে খুব রোগা পাতলা ছিল। সে বড়জোর আল-কায়েদার ছোট খাটো কোনো সমর্থক হতে পারে কিন্তু প্রশিক্ষক নন। আমার মনে হয় আফিয়ার সাথে ওসামা বিন লাদেনের যোগাযোগ ছিল।

২য় ব্যক্তি : তাহলে বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার করতে কেনো আফিয়াকে কাজে লাগানো হলো না?

মিঃ শওকত : তারা তো বোকা নয়। তারা আফিয়াকে তাদের পরবর্তী ঠিকানার ব্যাপারে জানায়নি। আমরা আফিয়াকে গ্রেফতারের সময় তার সন্তানদেরকেও আমাদের সাথে নিই। বাচ্চারা সবাই আমেরিকায় জন্মগ্রহন করেছে। সকলেই আমেরিকার নাগরিক।

এরপর কিছু এলোমেলো আলোচনার পর আবার আফিয়ার কন্যা মারিয়াম ফেরত আসার এর কথা উঠে আসে।(এখানে দুই অচেনা কন্ঠা শোনা যায়)

মিঃ শওকত : অহ, আরেকটা ব্যাপার, তারা আফিয়ার মেয়েকে গতকাল ফেরত পেয়েছে।

২য় ব্যক্তি : হ্যাঁ, সে ইতোমধ্যে বাড়িতে আছে।

মিঃ শওকত : হুম, সে এখন বাড়িতে৷ সেও কারাগারে ছিল৷ খুব সম্ভবত সাত কিংবা আট বছরের মেয়ে৷ শুধু ইংরেজিতে কথা বলতে পারে৷

৩য় ব্যক্তি : আট বছরের?

মিঃ শওকত : হুম, বাচ্চারা সবাই কারাগারেই ছিল এবং তারা সবাই আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলে৷

২য় ব্যক্তি : এটা পাঁচ ছয় মাস আগের ঘটনা৷৷

৪র্থ ব্যক্তি : সে কি করাচিতে?

মিঃ শওকত: সে বাড়িতে ফিরে গেছে, না না গতকাল৷

২য় ব্যক্তি : আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি এখানে আসার অনেক আগেই শুনেছি৷

মিঃ শওকত : আমি এই সংবাদ আজ অথবা কালই পড়েছি৷ হয়ত আজ রাতেই৷

২য় ব্যক্তি : এটা দুই তিন মাস পুরোনো সংবাদ৷

মি. শওকত এই টেপে আরো বর্ণনা করেন, কিভাবে পুলিশ ও আইএসআই মিলে পাকিস্তানের জনগনকে গুম করে এবং গ্রেপ্তার করে। মানবাধিকার কর্মী আমিনা মাসুদ জানজুয়া'র মতে, সন্ত্রাসবিরোধী এই যুদ্ধে ৫০০ জনের মতো মানুষ এখন পর্যন্ত নিখোঁজ সিন্ধু এবং বেলুচিস্থানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তালিকা ছাড়াই৷ অডিওর একাংশে মি. শওকত বর্ননা করেন, কিভাবে তারা জাল ও ভুয়া প্রমান তৈরি করে৷ কিভাবে তারা 'বডি ডাবল' (একজনের শরীরে অন্যজনের মুখ লাগিয়ে ভিডিও, কিংবা ছবি বানানো) পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন জঙ্গি হামলাকারীদের ভুয়া পরিচয় তৈরি করে৷ এমনকি মুম্বাইয়ের জঙ্গি হামলাতেও তারা এই কাজ করেছে৷ আর এই কাজগুলো খুব গোপনীয়তার সাথে হয়৷ যাতে ডান হাতে হলে বাম হাতও জানতে না পারে৷

আফিয়ার নিখোঁজের ব্যাপারে এত বেশি বিরোধপূর্ন ব্যাখ্যা দেখা গেছে, যার মধ্যে কিছু তার পরিবারের সদস্যদের থেকেও বর্নিত হয়েছে আফিয়া নিখোঁজের ৫ বছর পরেও! এব্যাপারে John Le Carré এর এই কথা যথার্থ, "এটা জানা অসম্ভব কিভাবে এবং কোথায় তাকে কাউন্টার টেরিজম ইউনিট পাকিস্তানে বিন লাদেন ও অন্যান্য আল-কায়েদা নেতাদের খুঁজতে ব্যবহার করেছে৷"

অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, আফিয়ার এই অগ্নি পরীক্ষার সময় তার সন্তানরা সাথে ছিল না৷ বরং তাদের আলাদা জেলে রাখা হয়েছিল৷ আর তার তৃতীয় সন্তান যে কিনা মাত্র ছয় মাসের, সম্ভবত তার মৃত্যু হয়েছে৷ বহু বছর হতে চলল, আফিয়ার আর তার সন্তানদের নিখোঁজ আর পরবর্তীতে তাদের হদিস পাওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধোঁয়াশার৷

এই ধোঁয়াশার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যখন ২০০৮ সালে আফগানিস্তানে আফিয়ার রহস্যজনক ভাবে উত্থান হয়৷ এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া যায়৷ তার শরীরে এক মার্কিন সৈন্য দু'বার গুলি চালায়৷ 'জন কিরিয়াকাও'

নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত সিআইএ কর্মকর্তা যার আল-কায়েদাকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা আছে তিনি ABC News কে জানান, "আমরা খুব গুরুত্বপূর্ন একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছি৷ যাকে আমরা ২০০৩ থেকে খুঁজছিলাম৷ আমরা জানতে পেরেছি সে একাধিক হামলার পরিকল্পনা করছিল কিংবা পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিল৷" তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার সময় থেকেই পশ্চিমা গণমাধ্যমে এই সংবাদগুলোই ঘুরছিল৷

তার বিচারকার্য পরিচালনা করা হয় New York কোর্ট এ৷ তার বিরুদ্ধে খুব চালাকির সাথে একজন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা চেস্টার অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে ৮৬ বছরের সাজা দেওয়া হয়৷

আফিয়া যে কিনা একজন উচ্চশিক্ষিতা যুবতী এবং তার পরিবারের বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষিত এবং পশ্চিমে বসবাসরত৷ সে এমআইটিতে বায়োলোজির উপর পড়াশোনা করেছে এবং ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটি থেকে তত্ত্বীয় স্নায়ুবিজ্ঞানে পড়াশোনা করে 'অনুকরণের মাধ্যেম শেখা' থিসিসে পিএচডি অর্জন করেছেন৷ আফিয়া শিশুদের কিভাবে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পড়ানো যায় এ ব্যাপারে উচ্চতর গবেষণা করেছে এবং শব্দান্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষাদান করেছে৷ এর পাশাপাশি সে বোস্টনে মুসলিমদের জন্য কাজ করেছে৷ সে বসনিয়ান রিফিউজি মুসলিমদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে কেক বিক্রি করেছে৷ এক পাকিস্তানি ডাক্তারের সাথে আফিয়ার বিয়ে হয় এবং সে তিন সন্তানের জননী৷

বোস্টনে অবস্থান কালে যখন তার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন তার জীবনে কষ্টের কালোছায়া নেমে আসে৷ তার প্রফেসরদের মতে সেই সময়টাতে তার চেহারায় সাথে কষ্টের ছাপ দেখা গেছে৷ সে ২০০১ সালে পাকিস্তান ফিরে আসে৷ এরপর আবার আমেরিকায় ফেরত যায় এবং সে তৃতীয়বারের মতো অন্ত:সত্ত্বা হয়৷ ১৫ আগস্ট ২০০২

সালে আফিয়ার বাবা মারা যান। ঐ ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বর্ণনা করেন, ডাঃ আমজাদ খান আফিয়ার বাবাকে ধাক্কা দেয় এতে সে পড়ে যায় এবং হার্ট এট্যাকে তার মৃত্যু হয়। তখন আফিয়ার গর্ভে তার তৃতীয় সন্তান তার ছিল। এরপর আমজাদ খান এর সাথে আফিয়ার বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং এর কিছু দিন পরে আমজাদ খান নতুন করে বিয়ে করে। ডাঃ খান ২০০২ সালে এফবিআই নজরদারিতে আসে, যখন তারা বোস্টনে বসবাস করতো। সে ইন্টারনেটে নানা রকম লেখা প্রকাশ করত। সে জানায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি কিন্তু তাদের উভয়কেই এফবিআই নজরদারিতে রাখে।

মার্চ ২০০৩ তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসেবাদের জন্য এফবিআই দুনিয়াব্যাপি এলার্ট জারি করে। আফিয়া নিখোঁজের কয়েক দিন আগেই ডাঃ খানকে মার্কিন ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা চার ঘন্টা যাবৎ জেরা করে এবং তার উপর থেকে সকল সন্দেহ দূর উঠিয়ে নেয়। এর আগে ডাঃ খান সৌদি আরব এ কিছুদিন অবস্থানের পর পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন।

ডাঃ খান Harpers Magazine বলেন “গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যুক্ত একজন তাকে জানায় আফিয়া সিদ্দিকীকে খুব শীগ্রই গুম করা হবে।” পরে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তার সন্তানরা কোথায় সে তখন বলে, এই ব্যাপারে কিছুই জানে না, যা আগের বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ন। সে Harpers Magazine কে এটাও জানায় তার গাড়ি চালক ২০০৫ সালে আফিয়াকে করাচিতে একটি ট্যাক্সিতে দেখেছে। কিন্তু সে তাকে অনুসরণ করেনি। ২০০৮ সালে আফিয়া গ্রেপ্তার হলে আমজাদ পাকিস্তানের ডেইলি নিউজকে জানায়, সে মনে করে তার প্রাক্তন স্ত্রী আফিয়া উগ্রবাদী ছিল এবং সে অবশ্যই লুকিয়েছিল। Harpers Magazine কে ডাঃ খান আরো বলেন, সে আইএসআই থেকে একটি সুসংবাদ শুনেছেন যে তার সন্তান মারিয়াম এবং সুলাইমান জীবিত ও সুস্থ আছে এবং তারা তাদের খালা ফাওজিয়ার সাথে আছে। (এটি আমজাদ খানের স্পষ্ট

মিথ্যাচার কারন তখন মারিয়াম জেলে ছিল আর সুলাইমানের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি)

ড. আফিয়া সিদ্দিকী নিখোঁজ হওয়ার পরপরই ঝড়ের বেগে একই ভাবে গ্রেপ্তার ও নিখোঁজ হতে থাকে অনেকে৷ এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খালিদ শেখ মুহাম্মদ৷ যাকে ৯/১১ এর হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসেবে দাবি করা হয়৷ এ ছাড়াও খালিদ মার্কিন সাংবাদিক ডেনিয়েল পার্লকে ২০০২ সালে হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামী৷ খালিদ আমেরিকানদের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ন ছিল৷ তাকে প্রতিমাসে ১৮৩ বার পানিতে চুবিয়ে নির্যাতন করা হয়৷ ড. আফিয়া সিদ্দিকী নিখোঁজের কয়েক দিন পরেই খালিদ শেখ মুহাম্মদ এর ভাতিজা আম্মার আল বেলুচি ৯/১১ এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হোন৷ এরপর তাদের দুইজনকে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠানো হয়৷ অনেকের মতে তাদেরকে গুয়ান্তানামোতে পাঠানোর আগে সিআইএ পরিচালিত গোপন কারাগারে নির্যাতন করা হয়৷

এরপর মার্কিন কর্তৃপক্ষ দাবি করে আল-কায়েদার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আফিয়াকে খোঁজা হচ্ছে এবং আম্মার আল বেলুচি তার ২য় স্বামী৷ আফিয়ার পরিবার এবং পাকিস্তানের অন্যান্য সংস্থাগুলো এই অভিযোগ অস্বীকার করে৷ কিন্তু এটাই হয়তো তার বিরুদ্ধে করা এমন অভিযোগ যা বারবার করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাকে জঙ্গি প্রমানের চেস্টা চালানো হয়েছে৷ আফিয়াকে কেন্দ্র করে বানানো আষাঢ়ে গল্প শুধুমাত্র এটাই নয়, এ ছাড়াও জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা ২০০১ সালে লাইবেরিয়া আল-কায়েদার পক্ষ থেকে কুরিয়ার এর মাধ্যমে “ব্লাড ডায়মন্ড” পাঠানো হয় আফিয়ার কাছে৷ তার আইনজীবী এলাইন শার্প এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সেই সময়ে আফিয়া বোস্টনে ছিল এবং সে এটা প্রমান করতে পারবে৷ যাই হোক এই গল্প বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ কিন্তু এর মধ্যেই আফিয়ার যে দূর্নাম হবার তা হয়ে গিয়েছিল৷

পাঁচ বছরে আফিয়া এবং তার সন্তানদের সাথে কি হয়েছিল তা আমরা কেউ জানি না। অনেক গুজব বাতাসে ভেসে বেরিয়েছে, অনেকে বলেছে সে নির্মম ভাবে মারা গেছে আবার অনেকে তাকে ব্যবহার করেছে আল-কায়েদার নির্মমতা বোঝাতে। বাগরামে অনেক বন্দিই দাবি করেছে তারা আফিয়াকে সেখানে দেখেছে। কিন্তু WikiLeaks এর দেওয়া তথ্য মতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি হচ্ছে তারা তার ব্যাপারে কিছুই জানতো না। পাকিস্তানের একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নাজিব আহমেদ, যিনি আফিয়ার অন্তর্ধানের এই পাঁচ বছরের ঘটনা প্রবাহের উপর নজর রেখেছিলেন, তিনি আফিয়াকে গ্রেপ্তার করার সাথে জড়িত থাকা একজন সাক্ষীর বরাত দিয়ে বলেন, এটা এফবিআই এবং পাকিস্তানের যুক্ত অভিযান ছিল। (এই রিপোর্ট প্রকাশের পরের দিনই নাজিব আহমেদ রহস্যজনকভাবে হার্ট এট্যাকে মারা যান।)

২০০৮ সালের জুলাই’র মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের একজন আইনজীবী জোর দিয়ে দাবি করেন যে, আফিয়া সিদ্দিকী ইসলামাবাদে আছে। নাটকের ২য় পর্বে, এর দুই দিন পরেই আফিয়াকে আফগানস্তানে নাটকীয়ভাবে বিপুল পরিমান বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় সে আমেরিকায় ব্যাপক ভাবে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছিল। এরপর বলা হয় গজনি পুলিশ ষ্টেশনে আফিয়া এক মার্কিন অফিসারকে উদ্দেশ্য করে গুলি করলে আরেক মার্কিন অফিসার তাকে গুলি করে এতে সে আহত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সেই ঘটনায় কোনো মার্কিন কর্মকর্তা বা এফবিআই এর কেউ হতাহত হয়নি, কিন্তু আফিয়াকে গুরুতর আহত অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি করা হয় এবং হত্যা চেস্টার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নাটকের ৩য় পর্ব মঞ্চস্থ হয়, নিউইয়র্ক কোর্টে। সেখানে তাকে গুলি করে মার্কিন সৈন্য এবং এফবিআই কর্মকর্তাকে হত্যা চেস্টায় অভিযুক্ত করা হয়। আল-কায়েদার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি।

তার প্রথম আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ‘লিজ ফিংক’কে, যিনি বিখ্যাত রাজনৈতিক আইনজীবী। পরবর্তীতে সে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলে ‘ডন কার্ডি’কে নিয়োগ দেওয়া হয় যিনি বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ক আইনজীবী। পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক ‘লিন্ডা মেরেনো’কে প্রধান আইনজীবী নিয়োগ করা হয় যিনি এর আগে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ সংশ্লিষ্ট মামলায় সফলতা পেয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল, ‘প্রফেসর সামি আল আরিয়ান ও গাসসান এলাসি’ এর মামলা এবং সে গুয়ান্তানামো বে’র ডিফেন্স আইনজীবী। এ ছাড়াও মিসেস মেরেনো তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য পরিচিত। তিনি সেই সব আইনজীবীদের মধ্যে একজন যারা কিনা আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট লিডার লিওনার্ড পেল্টির সাথে কাজ করেছিল। তার টিমে যুক্ত ছিল চার্লি সুইফট যিনি মিলিটারি কমিশনের সমালোচক ও গুয়ান্তানামো বে’র ডিফেন্স আইনজীবী। টিমে আরো ছিল আইনজীবী এলাইন শার্প।

এই মামলার ভিত্তি এতই দুর্বল যে, যা নানা রকম হাস্যকর ও পরস্পর বিরোধী কথায় পরিপূর্ন। কেউ আফিয়াকে বন্দুক হাতে নিতে দেখেনি, সেখানে আফিয়াকে যে গুলিতে আহত করা হয়েছে সেই গুলির খোসা ব্যতীত আর কোনো গুলির খোসা বা কোথাও গুলি লাগার চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় নি। আফিয়ার আইনজীবী দুইবার আফগানিস্তানে ফরেনসিক এভিডেন্স আনতে গিয়েছে। যা এই মামলাকে ডিসমিস করে দেবার জন্য যথেস্ট ছিল। লিন্ডা মেরেনো ফরেনসিক রিপোর্ট এর ব্যাপারে বলেন, সেখানে এমন কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যে যার মাধ্যমে প্রমান করা যায় আফিয়া বন্দুক স্পর্শ করেছে, না কোনো ডিএনএ, না আংগুলের ছাপ, না গুলির খোসা, না কোথাও গুলি লাগার চিহ্ন- কিছুই পাওয়া যায় নি। সেনাবাহিনী, এফবিআই আর সাক্ষী পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে এমনকি তারা আগের বক্তব্যের সাথে বর্তমান বক্তব্যেরও কোনো মিল পাওয়া যায় নি। আফিয়ার আইনজীবী বলেন, সরকার আদালতকে আফিয়ার অতীতের কথিত জঙ্গিবাদের গল্পের ভয় দেখিয়েছে এবং এই মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে গেছে।

আদালতে কোনো প্রকার প্রমান উপস্থিত করা হয়নি৷ শুধু মাত্র WikiLeaks প্রকাশিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়৷ যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের তৈরি করা রিপোর্ট ছিল৷ সেটা কোনো সেনাবাহিনীর তৈরি করা রিপোর্ট ছিল না৷ কাজেই আফিয়ার পক্ষে প্রমাণাদির ঘাটতি ছিল৷ রিপোর্টে এটা বলা হয়নি আফিয়া গুলি ছুড়েছে, শুধু বলা হয়েছে আফিয়া তাদের দিকে বন্দুক তাক করে এবং গুলি করতে উদ্যত হয়৷ ছয় জন মার্কিন সৈন্য আদালতে এ ব্যাপারে শক্তিশালী সাক্ষ্য দেয়৷ মিসেস মেরেনো আমাকে বলে, WikiLeaks এর তথ্য আমার আর্গুমেন্ট এর সাথে হয়ত যুক্ত করা যেত, আমেরিকান সৈন্যদের কথাকে কতটা বিশ্বাস করা যায় এর প্রমাণে৷

আফিয়ার সাথে তার আইনজীবীর সম্পর্ক খুব অত্যন্ত জটিল ছিল৷ সে খুব ভেঙ্গে পড়েছিল, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল৷ আমার হৃদয় ভেঙ্গে যায় যখন আমি দেখি আফিয়া কোনো আইনজীবীকেই বিশ্বাস করছিল না এমনকি আমাকেও না৷ যদিও আমি তার ব্যাপারটা বুঝতে পারি! সে আমাকে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধকারীদের নিয়ে আমার কাজ মনে করিয়ে দেয়৷ তার প্রতিরোধ পুরোপুরি আইন অনুযায়ী ছিল এবং সে সকল আইনজীবীদের এই কাজের অংশ হিসেবে দেখেছে৷

আইনজীবীদের কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আফিয়া বারবার আদালতে কথা বলে, সে জানায় তাকে এবং তার সন্তানদের আমেরিকানরা গুপ্ত কারাগারে নির্যাতন করেছে৷ সরকার তার বলা এই কথাগুলোকে কখনই খন্ডন করতে পারে নি৷ কিন্তু সে আদালতের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের ব্যাপারে খোলা খুলি ভাবে সন্দেহ পোষন করে মেরেনো বলেন, "দুভাগ্যজনক ভাবে সে অনেক সময় অহংকারী ও খামখেয়ালি আচরন করত আবার অনেক সময় অসংলগ্ন আচরন করত৷" আরেকজন পর্যবেক্ষক এর মতে "সে খুবই স্পষ্টভাবে বুদ্ধিমত্ত্বার সাথে কথা বলে, কিন্তু মানুষ তা ঠিক ভাবে নিতে পারেনি৷"

নিউ ইয়র্কের জুরির রায় ছিল পূর্বলিখিত৷ মিসেস মেরেনো সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “আমি ৩০ বছর যাবৎ আদালতে কাজ করছি আমি আমার জীবনে এমন কিছু আগে কখনো দেখিনি৷ জর্জ হেঁটে আদালতে প্রবেশ করলেন, এজলাসে আগে থেকেই ছাপানো পাওয়ার পয়েন্ট এর কিছু ডকুমেন্ট ছিল আর তিনি সেখান থেকে ৮৬ বছরের সাজা শোনালেন৷”

দু’জন অভিজ্ঞ আইনজীবী যারা এই মামলার সাথে যদিও জড়িত ছিলেন না, কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনের ব্যাপারে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে৷ তারা এই মামলার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, ‘অস্বাভাবিক’, ‘হাস্যকর’, ‘অবমাননাকর’। আরেক জন মন্তব্য করেন ‘নানা রকম ফাঁকফোকরে পরিপূর্ন’। তারা এর বিরুদ্ধে আপিল করার পরিকল্পনা করেন৷

পাঁচ বছরের ঘটনা প্রবাহের অনেক অজানা দিক রয়ে গেছে৷ এই ঘটনা আফিয়ার তিন সন্তানের দুই জনের মাথায় রয়েছে৷ বড় দুই জন আমেরিকার নাগরিক৷ তাদের আলাদা আলাদা ভাবে পাকিস্তানে পাওয়া যায়৷ তারা এখন তাদের নানী ও খালা ফাওজিয়া যে কিনা একজন হাভার্ড থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ৷ সে বর্তমানে করাচিতে বসবাস করছে৷ তারা তাদের গল্প কখনোই বলেনি, কিন্তু তাদের থেকে যে ছোট্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় তাদের পরিবার কি বিভীষিকাময় অবস্থায় জীবন যাপন করছে৷

আফিয়ার বড় ছেলে আহমেদ তার খালাকে জানায়, সে শেষ বারের মতো তার মাকে দেখেছে যেদিন তাদের তুলে নেওয়া হয়৷ এরপর যখন সে তার মাকে পাঁচ বছর পর দেখে তখন চিনতে পারেনি৷ আহমেদ শুধু মনে করতে পারছে একজন মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি তাকে এসে জানায় সে মার্কিন নাগরিক এবং তার ভাই সুলাইমান মারা গেছে৷ আহমেদ এর মনে আছে, সে তার মা ও ভাইবোনের সাথে গাড়িতে ছিল৷ সে

মনে করতে পারে, জ্ঞান হারাবার পূর্বে তার ছোট্ট ভাইকে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। আহমাদ তার খালাকে বলেছে এরপর যখন তার জ্ঞান ফিরে সে দেখতে পায় একটি কারাগারে আছে, তাকে আলি ও অন্যান্য নামে ডাকা হচ্ছে। সে জানায় তার নাম আহমেদ। তার খালা বলেন আহমেদ PTSD তে ভুগছে এবং তার চিকিৎসা প্রয়োজন।

তার বোন মারিয়ামকে এর দুই বছর পর ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে পাওয়া যায়। সে পরিস্কার আমেরিকান উচ্চারনে ইংরেজিতে কথা বলে, সে উর্দু জানত না। তাকে তাদের করাচির বাড়ির বাইরে গলায় একটি চিরকুট ঝুলানো অবস্থায় নামিয়ে দেওয়া হয়। একটা পর্যায়ে আফগান প্রধানমন্ত্রী হামিদ কারজাই আফিয়ার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে যাতে তারা তাদের সন্তানকে ফেরত পায়।

যে অদৃশ্য শক্তি যারা আফিয়াকে তার সাথে কি হয়েছিল তা বিশ্ববাসীর কাছে জানাতে দিচ্ছে না, সে একই শক্তিই তার সন্তানদেরকেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা যা তারা প্রত্যক্ষ করেছে তা প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। ফিরে আসার পরে আফিয়ার সন্তানদেরকে অপহরনের চেস্টা চালানো হয়। এরপর থেকে তাদের বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি পাহাড়া বসানো হয়। তাদের নানীর ভাষ্যমতে দুই জন অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে বড় ব্যাগ হাতে তাদের বেডরুমের বাইরে দেখা যায়। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। এসময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে করে তারা পালিয়ে যান পুলিশ আসার আগেই।

সম্প্রতি ফাঁস হওয়া অডিও ইমরান খানের (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) মতো বিরোধীদলের নেতাদের পাল্লা ভারি করেছে। ইমরান খান আফিয়ার পরিবারকে দীর্ঘদিন যাবৎ সমর্থন দিয়ে আসছে এবং আফিয়াকে ঘরে ফিরিয়ে আনার কঠিন পরীক্ষার দিকে অগ্রগামি হচ্ছে।

এই ঘটনায় নতুন করে পালে হাওয়া লাগিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিককে লিখা ইন্ট্যারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্কের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর টিনা ফস্টারের চিঠি। যেখানে টিনা ফস্টার রেহমান মালিককে মনে করিয়ে দিয়েছে, গতবছরের এক সাক্ষাৎ এ সে তাকে কথা দিয়েছিল আফিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাবে। সেই চিঠিতে টিনা লিখেছে মার্কিন সরকার যেহেতু এখন তাদের কর্মচারী রেমন্ড ডেভিসকে ফেরত চাইছে। যে কিনা দুই পাকিস্থানি নাগরিককে গুলি করে হত্যা করেছে। কাজেই এটাই উপযুক্ত সময় আফিয়াকে ফেরত আনার ব্যাপারে অগ্রসর হবার। কিছু মার্কিন সিনেটর পাকিস্তানকে হুমকি দেয়, তারা যদি রেমন্ড ডেভিসকে ফেরত না দেয় তাহলে পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধ করে দিবে। হিলারি ক্লিনটন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এক বৈঠকে রেমন্ডকে ছেড়ে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু নিহত ফাহিম শামশাদের বড় ভাই ওয়াসিম শামশাদ বলেন, ঠান্ডা মাথায় আমার ভাইকে হত্যাকারীর কোনো মুক্তিপণই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে আটক বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মুক্তির বিনিময়ে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন। নিহত অপর দু'পাকিস্তানি ফাইজান হায়দার ও ইবাদুর রহমানের পরিবারও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন।

যাইহোক আফিয়া কি কখনো এই পাঁচ বছর তার সাথে কি হয়েছিল তা বলতে পারবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন। আফিয়া বিভিন্ন সময়ে একাধিক মানুষের থেকে যে পরিমান শারিরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে, তাকে যেভাবে তার পূর্ব পরিচিত ও পরিবার থেকে সম্পূর্ন আলাদা করে নির্জন স্থানে রাখা হয়েছে আসলেই কঠিন সব কিছু মনে করা। সেখান থেকে ফিরে আশাও তার জন্য অনেক কঠিন হবে । আইএসআই কি তাকে বা তার পরিচয় ব্যবহার করে আল-কায়েদাকে কোনো বার্তা প্রেরন করতে পেরেছে? যেহেতু টেপ অনুযায়ী সে আল-কায়েদার একজন ছোটখাটো কর্মী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলো আসলে একেকটা পরস্পর বিরোধী। যখন আফিয়া আহত

অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে ছিল তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় সে আল-কায়েদা নেতা খালিদ শেখের ভাতিজা বেলুচির স্ত্রী! কিন্তু পরবর্তিতে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ব্রুকলিন কারাগারে থাকা অবস্থায় সে খুব অসংলগ্ন আচরণ করত। খাবার দিলে সে বলত এগুলো তার বাচ্চাদের জন্য রেখে দিচ্ছে। আইনজীবী এলাইন শার্প যার সাথে আফিয়ার কয়েক বার দেখা হয়েছে তিনি বলেন, আফিয়ার মানসিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সে বর্তমানে টেক্সাসের কার্সওয়েল বন্দি আছে। যা কিনা আমেরিকার একমাত্র কারাগার যেখানে নারীদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা আছে। আফিয়াকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। কারাগারের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ যারা আদালতের জন্য আফিয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাদের মতে আফিয়া অসুস্থ হবার ভান করছে এবং তার মানসিক রোগী হবার যে দাবি করছে তা ভূয়া। কিন্তু অনেক ডাক্তার যারা এর আগে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের সাথে কাজ করেছে তাদের মতে দীর্ঘদিনের নির্জন কারাবাস, তার সন্তানদের থেকে পৃথক থাকা, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং আইএসআই এর কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের ফলে সে মানসিকভাবে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে।

সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে সরাসরি, মানসিক কিংবা আর্থিক সাহায্যকারী সকল ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী প্রত্যেককেই অবশ্যই প্রকাশ্যে এর মূল্য চুকাতে হবে। কিন্তু এক্ষত্রে পাকিস্তানের জনগনের দাবি একটাই তারা চায় যারা আফিয়াকে কিডন্যাপ করেছে, যাদের জন্য আফিয়ার এই অবস্থা তাদের জনসম্মুক্ষে বিচারের আওতায় আনা হোক।

ভিক্টোরিয়া ব্রিটেইন

উপদেষ্টা ‘কেইজপ্রিজনার্স’

সাবেক সহযোগী সম্পাদক (ফরেন), দ্য গার্ডিয়ান

আগামীর চ্যালেঞ্জঃ নীরবতার দায়

সত্য বলতে এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ ড. আফিয়া সিদ্দিকীর বিভ্রান্তিকর মামলার সাথে জড়িয়ে আছেন। এদেরকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমেই আছে এক বিশাল সংখ্যার বিভিন্ন দেশের মুসলিম ও অমুসলিম সাধারণ জনগোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য হলো আফিয়াকে ন্যায়বিচার পেতে দেখা।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি তুলনামূলক ছোট কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী কিছু মানুষের একটা ক্ষমতাশালী দল, যারা নির্মমভাবে সত্যকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে প্রস্তুত। এরা খোলাখুলি মিথ্যাচারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে অন্যদের ক্ষতি এবং বিশেষ করে আফিয়ার ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়।

পাকিস্তান সরকারের ভেতর এদের সংখ্যা অগণিত, আগেও ছিল আর এখনো আছে। একই কথা খাটে সর্বশেষ দুটো মার্কিন প্রশাসনের ক্ষেত্রেও। এদের গ্রুপের মধ্যে আছে সেই অন্ধকার বাহিনীও, যারা এই মিথ্যুকদেরকে সমর্থন করে এবং একই সাথে সমর্থন দিয়ে যায় সেইসব কূটনীতিক আর রাষ্ট্রদূতদের, যাদের হাতে রয়েছে ক্ষমতার বাগডোর।

আর এরপরে যে মানুষগুলো থেকে যায়, এরা সম্ভবত সবচেয়ে জঘন্য কিছু মানুষ যাদেরকে আমি বলি নিরাপদ দূরত্বে বসে থাকা দর্শক। বিখ্যাত আইরিশ দার্শনিক এডমান্ড বার্ক একবার বলেছিলেন, “মন্দের জয় তখনই হয় যখন ভালো মানুষেরা কিছুই না করে কেবল চুপচাপ বসে থাকে।” এডমন্ড বার্ক ভুল বলেননি। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম সংগঠনগুলোই আফিয়ার ব্যাপারে অস্বাভাবিকভাবে নীরব থেকেছে।

কেন তারা আজ স্তব্ধ হয়ে আছে? নাহ, হয়নি! প্রশ্নটা হবে, কেন তারা নিজেদের স্তব্ধ করে রেখেছে? অনন্তকালের লজ্জা নিয়ে তারা চুপ করে রয়েছেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী দুর্দশার ব্যাপারে। কেননা সরকারি অর্থায়নে চালানো একটা বেসরকারি প্রচারাভিযানের মাধ্যমে তাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে।

এটা আসলে খুবই সহজ একটা নিয়ম, ভাইয়েরা! একটা জিনিস ভুল মানে সেটা ভুল, পুরোপুরিভাবেই ভুল। একজন মেধাবী আফিয়া সিদ্দিকী আর তার তিনটি সন্তানের অপহরণ, নির্যাতন আর সমর্পণের ব্যাপারটায় অবশ্যই কিছু ভুল আছে।

আমেরিকায় বসে মজা দেখা লোকগুলো একেকটা কলঙ্ক। মেরুদণ্ডহীন ভীতু এই মানুষগুলোই বেশি মর্মপীড়ায় ভোগে। আমার মনে হয় জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা হচ্ছে একটা ভয়ংকর কষ্টের কারন।

মেরুদণ্ডের নিচে একটি হলুদ লাইন মানুষকে অন্যভাবে দেখতে বাধ্য করে, তাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়। বাধ্য করে উটপাখির মতো অবস্থান গ্রহণে। আর এই সবকিছুই

ফ্লোরিডার প্যাস্টর জোন্সের মতো ঘৃণা প্রচারকদের উত্থান আর পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার মতো বিষয়গুলোকে আরও সহজ করে তোলে।

এডমান্ড বার্ক ঠিক কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মন্দের জয় তখনই হয় যখন ভালোরা চুপটি মেরে বসে থাকে। যেসব সংগঠনের নেতাদের কথা আমি বললাম তারা সবাই ভালো মানুষ। কিন্তু তারা ভয়ের মধ্যে আছেন। আমি দু'আ করি যেন তারা তাদের সাহস ফিরে পান।

এই অস্থির সময়ে কিডন্যাপ, টর্চার, ওয়াটার বোর্ডিং আর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো শব্দগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারের কাতারে চলে এসেছে। উদ্ধত, অত্যাচারী আর ভয়ংকর রাজনৈতিক মেশিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে তো সাহস থাকা লাগবেই।

বিচারপতি রিচার্ড বারম্যানের নেতৃত্বে নিউইয়র্কের আদালতে আবার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হবার মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি রয়েছে। ধিক্কার তার প্রতি! এই রিচার্ড বারম্যান হলেন সেই ব্যক্তি যার আদালতে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে হাজির করা হয়েছিল এবং যে অমানবিক অবস্থায় আফিয়াকে আদালতে উপস্থাপন করা হয় তার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব!

কমপক্ষে একটি সরকারি প্রত্যর্পণ পদ্ধতি ছাড়া কিভাবে একজন পাকিস্তানি নাগরিককে তার আদালতে তোলা হল যার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ উঠেছে আফগানিস্তানে? কেন তিনি কমপক্ষে এ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোও দাবি করলেন না? শুরু থেকেই একটি অপবিচারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

তিনি আসামীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য মানসিকভাবে ফিট মনে করেন। অথচ নিজের লিগ্যাল টিম ঠিক করার মতো মানসিক সক্ষমতা আফিয়ার নেই বলে তিনি মনে করেন। যখন আফিয়া তার আইনজীবীদের বরখাস্ত করার পদক্ষেপ নিলেন তিনি এই অজুহাতে তার অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি নাকি মানসিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। আপনি এভাবে দু'মুখো হতে পারেন না, ইউর অনার!

বারম্যান সাহেব এখন পর্যন্ত নীরব রয়েছেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানির সাথে গোপন বৈঠক নিয়ে। এই বিচারিক প্রহসনের আরেকটি কারণ হিসেবে বলা যায় একমাত্র আইনি সহায়তা প্রদানকারী দলগুলোরই কোর্টের বিচারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মেরুদণ্ড আছে।

সমস্যা হচ্ছে, তথাকথিত 'ড্রিম টিম' আইনজীবী চার্লি সুইফট এবং লিন্ডা মোরেনোর ট্রায়ালের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় ২ মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দ করেছে পাকিস্তান সরকার, যা মিস্টার হক্কানিকে বানিয়েছে পুরোপুরি একজন খদ্দর। কিভাবেই বা সরকারী এই অর্থ কাজ করবে যখন ২০০৩ সালের মার্চে করাচির রাস্তা থেকে পাকিস্তান সরকার নিজেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে মিলে অপহরণ করেছিল আফিয়া সিদ্দিকী আর তার তিন সন্তানকে? বিচারিক প্রহসনের এটা হচ্ছে আরেকটি কারণ।

আর সব মিলিয়ে মিস্টার হক্কানীর ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে? এ লোকটা পেশাদার কূটনৈতিক নয়। আসলে তার আমেরিকান নাগরিকত্ব আছে, অথবা সেরকম উচ্চাশা আছে যেটা তাকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে 'বিশেষ পছন্দনীয়' করে তুলেছে। কূটনীতির জগতে তার জারিজুরি শেষ হয়ে গেলে তাকে আবার একজন লেকচারারের জীবন শুরু করতে হবে, এটা নিয়মিত বিরতিতে তার মার্কিন প্রভুরা তাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই ভদ্র মহোদয় ড. আফিয়ার কেইস নিয়ে এখন বেশ কিছুটা ব্যস্ত রয়েছেন। পশ্চিমা মিডিয়ায় কর্মরত আমার বেশ কিছু সহকর্মীর কাছে “অফ দ্যা রেকর্ড” হিসেবে কিছু কথা বলেছেন আফিয়ার ব্যাপারে আর সেটা হচ্ছে, মহিলাটি কত খারাপ!

সম্প্রতি তার এই মুখোশ খুলে গেছে যখন সে সিনথিয়া ম্যাককিনি, অত্যন্ত চমৎকার একজন মহিলা রাজনীতিবিদ, তাকে পাকিস্তানের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানানোতে। আফিয়ার এই কেইসে সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন সিনথিয়া।

যেখানে পাকিস্তানের বধ্যভূমিতে ব্ল্যাকওয়াটারের অস্ত্র আর মার্সেনারিদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে হক্কানিকে বিন্দুমাত্র চিন্তাও করতে হয়নি, সেখানে একজন প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যাকে যেতে না দেওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত সঠিক একটি সিদ্ধান্ত। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে যাবার পর সে মোচড়াতে থাকলো ঠিক যেন নিজেরই বানানো বড়শির হুকে আটকে যাওয়া একটা কীট। সে তার এই দু’মুখো চেহারার অপমানজনক প্রকাশ থেকে পালাতে পারেনি।

যদি এই পুরোটা সময় ধরে সে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে তাহলে একটু চিন্তা করুন, বিচারপতি বারম্যানের সাথে গোপন মিটিং এর সময় তার মাথায় কত আজেবাজে জিনিস সে ভরে দিয়েছে। অন্য কোনো দেশ হলে এরকম গোপন মিটিং এর খবর ফাঁস হওয়াটা দু’জনের জন্যই ক্যারিয়ার বিধ্বংসী হতে পারতো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ন্যায়বিচার’ বিরল একটি বিষয়।

হ্যাঁ, এটা একটা সিরিয়াস অভিযোগ এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিচারককে এটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু তিনি আমাকে ফ্যাক্স এবং ফোন ব্যবহার থেকে নিষিদ্ধ করেছেন! হাস্যকর ব্যাপার হল লন্ডনের যে এলাকায় আমি থাকি সেখানে তার কোনো আইনগত অধিকার নেই। নিশ্চিতভাবেই সে ভাবছে আফগানিস্তানে কথিত অপরাধের জন্য যদি সে বিচার বসাতে পারে, তাহলে আমাকেও ধরে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে।

আসুন আমরা ফিরে যাই ড. আফিয়ার মামলায় যেখানে ন্যায়বিচারের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। সবকিছুই করা হচ্ছে আমেরিকা ও পাকিস্তানের কিছু মানুষের নাম আর পদবি রক্ষার জন্য যাদের মধ্যে রয়েছে অতীত বর্তমানের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের রাজনীতিবিদ আর তাদের কাপুরুষ কূটনৈতিকরা।

আর এসবের মানে যদি হয় তাদের উচ্চাকাঙ্খার আগুনে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর হত্যা, তাহলে এই নির্মম মানুষগুলো ইতোমধ্যেই এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা এটা করার জন্য একটু বেশিই যোগ্য।

এখন সিদ্ধান্ত আপনার- নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবেন। সত্যের পক্ষে কাজ করা সবসময়ই খুব একটা সহজ নয়। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা একটি বাহিনী আফিয়ার জন্য ন্যায়বিচারের পক্ষে এই লড়াই চালিয়ে যাবে। না আমরা নিরব হয়ে যাব, আর না আমরা হার মেনে নেব।

ন্যায়, বিবেক আর মানবতার স্বার্থে আসুন, আমরা সবাই মিলে এই প্রহসনের ইতি টানি আর একজন নিরপরাধ মাকে তার পরিবারের সাথে আবার মিলিয়ে দিই।

ইভন রিডলি

ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম উইমেনস ইউনিয়নের ইউরোপিয়ান শাখার সভাপতি এবং কেইজপ্রিজনারস (Cageprisoners) এর উপদেষ্টা। ২০০১ সালে ইভন রিডলি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অংশ হিসাবে গোপনে আফগানিস্তানে গিয়ে তালেবানের হাতে বন্দি হন। পরবর্তীতে মুক্তি পেয়ে ইসলাম গ্রহন করেন। তালেবানের হাতে বন্দির ঘটনা নিয়ে ‘ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান’ নামে একটি বই লেখেন ইভন রিডলি। যা বাংলায় প্রকাশ করেছে ‘নবপ্রকাশ’।

মুসলিমরা কেন নীরব?

সিদ্দিকী পরিবারের একজন ভালো বন্ধু (এখন আমারও একজন মূল্যবান বন্ধু), যিনি আফিয়া, তার মা, বোন, ভাই আর তার পুরো পরিবারকে বহু বছর ধরে চেনেন, তিনি আমাকে ইমেইলে একটি মেসেজ পাঠিয়েছেন। সম্প্রতি মুহাম্মাদের সাথে তার বোনের এক বেদনাদায়ক সাক্ষাতের সময়েই এই মেসেজটি এসে পৌঁছলো (আড়াই বছরের মধ্যে এটা মাত্র দ্বিতীয়বারের দেখা)।

মাউরি,

আমি মুহাম্মাদের সাথে ফোর্টওয়ার্থে আছি। সে আফিয়ার সাথে দেখা করার চেষ্টা করছে। সকাল সকালই কারাগারে যাবার জন্য বেরিয়ে গেছে সে। তাকে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি দেখা করার ব্যাপারে। তাই সে নিশ্চিত হতে পারছে না ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া

হবে কিনা। এখন সাড়ে বারোটা বাজে আর এখনো মুহাম্মদ ফেরেনি। তার মানে নিশ্চয়ই ওকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আমি আটকে গিয়েছি। আমি যা জানি তা সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে দিতে চাচ্ছিলাম পুরো দুনিয়াকে। আর অন্যদিকে আমার পরিবার, যারা আমাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে কিছু কথা বলেছে। আমি এ দু'য়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। রীতিমতো উভয় সংকট!

আজ আট বছর হয়ে গেল আফিয়া আর তার সন্তানদের অপহরণের। এতদিন ধরে এই কেইস নিয়ে লেখালেখি করতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। আমি তিনটে শব্দও এব্যাপারে এক করতে পারিনি। যদি করতে পারতামও, তাহলেও কারাগার সব ধরনের তদন্ত করার অধিকার রাখে। কারাগার থেকে কিছু একটা স্বীকার না করে নেওয়া পর্যন্ত কেউই কিছু প্রমাণ করতে পারে না।

আজ সকালে এই ভেবে ঘুম থেকে উঠছিলাম যে হয়তো সদোম আর গোমোরাহকে ধ্বংস করে ইশ্বর কোনো অতিপ্রতিক্রিয়া দেখাননি। নুহের মহাপ্লাবনও হয়তো শেষমেশ ভালো কিছুই ছিল।

কিভাবে আপনি এসব মামলা মোকদ্দমা নিয়ে বেঁচে আছেন অথচ একবারও দেওয়ালে বাড়ি মেরে আপনার নিজের মাথা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছা হয় না, সেটা আমি ভেবে পাই না। আমি শুধু এই একটা কেস নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি। আমার কিছু বন্ধু আছে যারা বহু আগেই আমাকে ডাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি সেইসব লোকের জন্য কাজ করি যারা বিশ্বাস করে কিন্তু তারা জানে না আমি কি করছি যখন ফোর্টওয়ার্থের দিকে রওনা দিই। পরিবারের লোকেরা ভাবে আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার এক ভাই আমাকে

খোলাখুলি বলেছিল, আফিয়ার ব্যাপারে সে আর কিছু শুনতে চায় না। কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমি গেলে সে আর তার পরিবারের লোকজন সেখানে যেতো না।

আরেকদিকে আমার শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণু বলে যাচ্ছিল আফিয়ার পরিবারের জন্য এটা আমার করা উচিত এবং আরো বেশি করেই উচিত। কিন্তু এখন, এই মূহূর্তে আমি আফিয়ার কাছ থেকে দশ মাইল দূরে বসে আছি এবং সর্বোচ্চ যা আমি করতে পারি সেটা আমি করাচিতে থেকেও করতে পারতাম।

আমি দুঃখিত। গত ২৪টি ঘন্টা আমার ভালো কাটেনি। আমার শুধু নিজেকে একটু হালকা করার দরকার ছিল আর এজন্য আপনাকেই পেলাম। আমি বুঝতে পারছি সামনের ছুটির দিনেই ঈদ উল আযহা। ঈদ মুবারাক।

-অ্যান্ডি

এই ইমেইলটা লেখার পেছনে কারণ ছিল আফিয়ার ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি, ধর্ষণ আর গর্ভপাতের ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়া গুজব, ক্যান্সারের সম্ভাবনা এবং সত্য যাই হোক না কেন এগুলোর ব্যাপারে আরো বহু প্রাতিষ্ঠানিক লুকোচুরি- এসব কিছু সংক্রান্ত এখনো অপ্রমাণিত কিছু প্রতিবেদন।

ইমেইলে পাঠানো অ্যান্ডির কষ্টগুলো আমাকে সাথে সাথেই ছুঁয়ে যায়। আমার ভালোর জন্য ওর উদ্বেগেরও প্রশংসা করি। এমন কত অগণিত সময় গেছে যখন আমি আমার নিজের অন্ধকার মূহূর্তগুলোর অনুভব করেছি। এগুলো ছিল সেই সময় যখন অন্তরের প্রশান্তির জন্য আমাকে ফিরতে হয়েছে সর্বশক্তিমানের কাছে। ও অন্তর সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির করে দাও। (ইয়া মুক্বাল্লিবাল

ক্বুলুব, সাব্বিত ক্বলবি 'আলা দ্বীনিক)। সত্য হচ্ছে, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কিছু মূহুর্তগুলো কোনো শত্রুর কাজের ফলাফল হিসেবে আসেনি। বরং এগুলো এসেছে আমার নিজেরই বিশ্বাসের মানুষদের কাছ থেকে।

আফিয়া সিদ্দিকীর বোস্টনে থাকাকালীন তার পরিচিত সেখানকার মুসলিম নারী পুরুষদের অন্তরে বসে যাওয়া ভয় তাদের ভেতরের ভালোটিকে আটকে রেখেছিল। যখন ভয়ের সাথে অহংকারী আত্মস্বার্থের সম্মিলন ঘটে তখন এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। 'মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ'র ইমাম আবদুল্লাহ ফারুক্ব। রক্সবারির একটি মসজিদ। একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম নারী আফিয়া সিদ্দিকীর সমর্থনে তিনি ছিলেন এক সোচ্চার কন্ঠস্বর!

সত্যিকার ঈমান যার মধ্যে রয়েছে 'ক্বাদর' এর উপর বিশ্বাস (কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞান আর অনুমতির বাইরে ঘটে না) আর এটা এমন এক জিনিস যার ব্যাপারে মুসলিমরা পড়ে থাকে। কখনো দ্বীনি ইলমের হালাক্বায় এবং বিভিন্ন কনফারেন্সে যার ব্যাপারে মুসলিমদের শেখানো হয়। এটা এমন এক বিশ্বাস যাকে আমরা আমাদের কথাবার্তায় প্রায়শই দার্শনিক একটা রূপ দিয়ে থাকি। কিন্তু এই মহাসত্যের ব্যাপারে সত্যিকারের সচেতনতা আমাদের অধিকাংশেরই গলার নিচে নামে না। আল্লাহর ক্বাদর সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে নেবার অর্থ হচ্ছে এই প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে নেওয়া যে যখন কোনো পরীক্ষা আমাদের উপর আপতিত হয়, সেটার মধ্যেও আমাদের জন্য ভালো কিছু আছে, যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই এবং ঈমানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ধৈর্য্য ধরে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। ঈমান হচ্ছে চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। কেননা চ্যালেঞ্জ আর বিতর্কের সময়গুলোতে আমাদের অবস্থানই দিন শেষে আমাদের সত্যিকার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

আত্মার এই অসুখ আমেরিকার মুসলিমদের জন্য নতুন কিছু নয়। এটা দীর্ঘদিনের এমন এক অভাব যা প্রত্যেকটা বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। 'কন্সটান্টিনিয়ান খ্রিস্টান' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ঈসা (আঃ) অনুসারীরা কিংবা 'সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও, আর আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও'- এই নীতিবাক্যে বিশ্বাসী কিছু মানুষের মাঝেও এ ধরনের অসুখ দেখা যায়।

গত ২৫ বছর ধরে মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করছি। ঠিক কতবার তা জানি না, কিন্তু এই লম্বা সময়ে দেখা হয়ে গেছে সব ছদ্মবেশী মানুষদের। আমি দেখেছি কিভাবে মানুষ নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে স্রেফ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আড়ালে লুকিয়ে যায়। বিশেষ করে এই কেইসটি আমার অন্তরে যেন চেপে বসেছে।

আমি জীবনে যত কেইসে জড়িত ছিলাম সেগুলোর কোনোটিই আফিয়ার এই কেইসের মতো নয়। এটা উন্মোচিত করে দিয়েছে ভয়ের রাজনীতি, স্বার্থপরতার রাজনীতি, গোত্রীয় রাজনীতি আর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের রাজনীতিকে। আফিয়া নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত এমন এক মুসলিম নারী যাঁর সাহায্যে আমেরিকার মুসলিমরা এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা খেয়াল রাখা উচিত যে কুরআন আর সুন্নাহ অনুসারে আজ আফিয়ার এই দুরবস্থায় মুসলিম পুরুষদের কাঁধে এক বিশেষ ফরয দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

শেষ কথা হিসেবে কিছু বলি। মাঝে মাঝে যখন কিছু করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আমি নিবেদিতপ্রাণ কিছু মুসলিমদের (যাদের মধ্যে অনেক সাহসী মুসলিম নেতাও আছেন) উদাহরণ দিই। তারা এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন এবং খুলে দিয়েছেন দুয়ার যাতে করে আমাদের বোন ড. আফিয়া সিদ্দিকী কমপক্ষে একটু হলেও ন্যায়সঙ্গত সহায়তাটুকু পান। আর এজন্য আমি আমাদের অন্তরের একেবারে

গভীর থেকে ভাই ও বোনেরা (আপনারা সবাই জানেন তারা কারা)- আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে মুসলিম হিসেবে কবুল করুক। মুসলিম তো সে, যে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সমর্পণ করেছে। আর আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সমর্পণের মাধ্যমে তাওফীক্ব দেন কণ্ঠহীনের জন্য কণ্ঠ হবার এবং আমেরিকা ও এই বিশ্বকে আরো ভালো একটি জায়গায় পরিণত করবার। আমীন।

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে.....

আলহাজ্জ্ব মাউরি সালাখান

ওবামার সময়ের অবিচার

একজন সাবেক আইনের শিক্ষক বারাক ওবামার কাছে নাগরিক স্বাধীনতা বেশ গুরুত্ব পাবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তার কাজেকর্মে সেই আশার প্রতিফলন ঘটে না। ইরাক এবং আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদ করে যেহেতু আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম। ছয়বার বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কারনে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে যে, পুলিশ প্রচুর মিথ্যে কথা বলে।

এইসব মিথ্যাচার অবশ্যই কেবল সড়কের আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গণবিধ্বংসী অস্ত্র (Weapon of Mass Destruction-WMD) থেকে শুরু করে আল-কায়েদার সাথে কারো সম্পর্ক, সবকিছু নিয়েই পেন্টাগন, সিআইএ, এফবিআই- তথাকথিত এসব সমস্ত সংস্থা মিথ্যার ঝুড়ি সাজিয়ে বসে থাকে। যেন তেন নিরীহ মিথ্যা না, "মাদার অফ অল বোম্বস" জাতীয় ভয়ঙ্কর মিথ্যার ঝুড়ি সাজিয়ে তারা শত শত নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে। আই এফ স্টোন এর সবচাইতে সুন্দর নামকরণ করেছেন, 'সরকারী মিথ্যা'।

আশা করি আমার অবস্থান স্পষ্ট করতে পেরেছি। এখন আমি এমন এক মামলা নিয়ে কথা বলতে চাই, যা কিনা ইউএস জাস্টিস হল অব শেইমের হাস্যকর তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য।

এবছরের ফেব্রুয়ারিতে, তিন সন্তানের মা পাকিস্তানের আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ইউএস ফেডারেল (ক্যাঙ্গারু) কোর্টে সাতটি অভিযোগ আনা হয়, যার মধ্যে দু'টিই ছিল "একজন আমেরিকানকে হত্যাচেষ্টা।" কপাট পক্ষপাতীত্ব দেখানো বিচারক বারম্যান সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখের দেওয়া এক রায়ে আফিয়াকে ছিয়াশি বছরের কারাদণ্ড দেন।

এমআইটি এবং ব্র্যান্ডিজে পড়াশোনা করা একজন প্রাজ্ঞ নিউরোসায়েন্টিস্ট ড. আফিয়াকে ঘিরে মিথ্যের পর্দা বুনন শুরু হয় বুশের শাসনামলে এবং তা পুরোদমে চলতে থাকে এই বছর "ওবামার (অ)বিচারিক আদালত" থেকে রায় আসার আগ পর্যন্ত।

নাইন ইলেভেনের আগে আফিয়া তার স্বামী এবং দুই সন্তানসহ ম্যাসাচুসেটসে থাকতেন। সমস্ত প্রতিবেদনেই দেখা যায় তিনি ছিলেন একেবারে নির্বিবাদী ধার্মিক মুসলিম (এবং

অবশ্যই আমেরিকাতে এটা এখনও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে ওঠে নি)। তা ছাড়া ছাত্রী হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। প্রচুর পড়াশোনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী রেজাল্ট করেছিলেন তিনি। কখনো কোনো কিছুরই ক্ষতি করেননি, কোনো মানুষের ক্ষতি তো বহু দূরের কথা।

৯/১১ এর পর তিনি বারবার তার স্বামীকে পাকিস্তানে ফিরে যাবার ব্যাপারে বলছিলেন। এরই মাঝে তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা হয়েছেন আফিয়া। আর এদিকে আমেরিকায় বাড়ছে মুসলিম বিদ্বেষ। সুতরাং অন্তত নিজ সন্তানদেরকে বাঁচাতে সেসময় পাকিস্তানে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত যে দূরদর্শী ছিল, এ কথা মানতেই হয়।

নির্মম সত্য

পাকিস্তানে ফিরে যাবার কিছুদিনের মাঝেই ড. আফিয়ার ডিভোর্স হয়ে যায়। এরপরই তার জীবন এক ভয়ঙ্কর বাঁকে মোড় নেয়। ৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী খালিদ শেখ মুহাম্মদের ওপর সিআইএ নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন। তারা তার ওপর প্রতিমাসে গড়ে ১৮৩ বার “ওয়াটার-বোর্ড” প্রয়োগ করত। এরই মাঝে এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন যে, ড. আফিয়া সিদ্দিকী আল-কায়েদার একজন সদস্য। সত্যিই কি আড়ালে আফিয়ার অন্য কোনো পরিচয় ছিল? নাকি আমি আপনি হলে নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যা করতাম, অর্থাৎ যেন তেন কিছু একটা বলে দিতেন?

আবার কিছু বিতর্কিত ‘গোয়েন্দাসূত্র’ থেকে বলা হয়েছে আফিয়া নাকি খালিদ শেখ মুহাম্মদের ভাতিজাকে বিয়ে করেছিলেন। এর চাইতে খোঁড়া অভিযোগ আর হতেই পারে না। তা সত্ত্বেও মার্কিন আইনে কাউকে সঙ্গীর অপরাধে দণ্ডিত করার কোনো স্থানই নেই।

খালিদ শেখ মুহাম্মদের সেই ‘স্বীকারোক্তি’র পর আফিয়াকে বুশ প্রশাসনের বিচার বিভাগ সবচাইতে ভয়ঙ্কর সাতজন আল-কায়েদা কর্মীর তালিকাভুক্ত করে৷ তিন সন্তানের মা, যিনি মুহূর্তের মধ্যে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম৷ যদি একজনের নিউরো-সাইকোলজিতে অসামান্য ফলাফল থাকে আবার তিনিই ‘সক্রিয় সন্ত্রাসী’ হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারেন, তাহলে ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের বরং উচিৎ হবে ক্রেন, পুল আর স্মিথকে ফোন করা৷৷

মিথ্যাবাদের অপসংস্কৃতি

এ কথা তো সবারই জানা আছে যে, ৯/১১ এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বহুবার ‘সন্ত্রাসী হামলার’ সতর্কতা জারি হয়েছিল৷ যার প্রেক্ষিতে শত শত নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷ আবু গারিবে কি বর্বরতা চালানো হয়েছে, সেটাও আমরা দেখেছি৷ আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হয় যে যুদ্ধবাজ ক্রিমিনাল কলিন পাওয়েল গোয়েন্দা সংস্থার ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হয়েছে৷ সে এতই ভ্রান্তিতে ছিল যে ইরাকে আক্রমণ করে দেশটাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছে৷ অথচ যখন তারা ড. সিদ্দিকীর মতো মানুষদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে তখন সেই একই গোয়েন্দা সংস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রাখার কথাই বলে৷

উদ্ভট ঘটনাটাকে খুব সংক্ষেপে বললে, ড. সিদ্দিকী এবং তার তিন সন্তান দু’হাজার আট সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর যাবৎ নিখোঁজ ছিলেন৷ হঠাৎ একদিন আফগানিস্তানের গজনীতে তার বড় সন্তান, এগার বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে তার উদয় ঘটে৷ ড. সিদ্দিকী দাবি করেন, এই বছরগুলোতে পাকিস্তান এবং আমেরিকার এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে তাকে বারবার স্থানান্তর করা হয়েছে৷ অসংখ্যবার তিনি হয়েছেন ধর্ষিত৷ ইভন রিডলিসহ আরও অনেক কারাবন্দিই জানিয়েছেন, সেই পাঁচবছরের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই তাকে বাগরাম বিমানঘাটির কারাগারে আটকে রেখে তার ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালানো হয়েছিল৷

আফিয়ার খোঁজ পাওয়ার পরপরই তাকে গ্রেফতার করে একটি আফগানী থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে দুইজন আমেরিকান মিলিটারি এবং দুইজন এফবিআই এজেন্ট মিলে দোভাষীর সাহায্য নিয়ে তাকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। এফবিআই এবং মিলিটারি দাবি করেছিল যে, তাদেরকে একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয় যার এক প্রান্তে ছিল একটি পর্দা। তারা জানত না যে পর্দার ওপাশে ড. আফিয়া ঘুমিয়ে ছিলেন। এখন থেকে আপনারা আরও যত পড়বেন, ততই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন ঐ দুই সংস্থার যারাই সেদিন জড়িত ছিল প্রত্যেকেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে।

আমেরিকানদের গল্প

তারা সেই রুমে প্রবেশ করার পর আমেরিকান মিলিটারিদের একজন তার অস্ত্রটি (মনে রাখবেন, তারা কিন্তু সে রুমে গিয়েছিল বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ভয়ঙ্কর মানুষটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য) নামিয়ে রাখে। ঠিক তখনই আফিয়া লাফ দিয়ে উঠে অস্ত্রটি হাতে নিয়ে নেন। চিৎকার করে গালি দিতে দিতে বলতে থাকেন তিনি আমেরিকানদের খুন করতে চান। পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চির পুরো শরীর নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন গুলি করার জন্য এবং দুইবার গুলি চালিয়েছেন। অথচ ছোট্ট সেই রুমের কারো গায়ে এতটুকু আঁচও লাগাতে পারেননি। এমনকি তার গুলি ঘরটির কোনো দেওয়াল, ছাঁদ কিংবা মেঝেও স্পর্শ করেনি। সেই রাইফেল থেকে বের হওয়া কোনো বুলেটও অবশ্য পাওয়া যায়নি।

এরপর একজন আমেরিকান ‘আত্মরক্ষার্থে’ গুলি চালায় এবং সেগুলো সিদ্দিকীর পেটে বিদ্ধ হয়। এমনকি আদালতে দেখানো হয় যে, অস্ত্রটিতে আফিয়ার আঙুলের ছাপও ছিল না। উল্টো যে বুলেটগুলো সেদিন পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলোও ছিল তার শরীরে। তাহলে, ৯/১১ এর পর থেকে নিয়ে এমন কত শত গালগল্প আমাদের শোনানো হয়েছে?

ঠিক এই মুহূর্তেই আমার দু’টির কথা মাথায় আসছে- প্যাট টিলম্যান এবং জেসিকা লিন্চ।

নিরাশায় ঢাকা অবিচার

ড. আফিয়ার বর্ণনা: যখন তিনি গ্রেফতার হন, তখন তাকে আবারও মারধর করা হয়। এরপর তিনি একটি বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর শুনতে পান তার রুমে কেউ কথা বলছে। তখন তিনি উঠে দাঁড়ান আর কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে, “আরে আরে, এই মহিলা তো শৃঙ্ক্ষলিত নয়।” চোখের পলকে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। জ্ঞান আসা যাওয়ার মধ্যেই শুনতে পান কেউ বলছে, “চাকরিটা বুঝি এবার হারালাম।”

ড. সিদ্দিকী গুলি করেছেন, এমন কোনো প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও তাকে ছিয়াশি বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, তার বিরুদ্ধে তারা ‘সন্ত্রাসী’ আইনেও অভিযোগ আনেনি, কারণ একমাত্র যে প্রমাণ তাদের হাতে ছিল, তা হলো কেবল নির্যাতনের মুখে খালিদ মুহাম্মদ শেখের স্বীকারোক্তি। তাই পশুগুলো একজোট হয়ে তাকে হত্যাচেষ্টার মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়।

যদি ড. সিদ্দিকী সেই মার্কিনীগুলোকে গুলি করতেনও, তাহলে কী হতো? ধরুন ড. বেটি ব্রাউন নামের কোনো এক আমেরিকান নারীকে ISI গ্রেফতার করে একইভাবে নির্যাতন, ধর্ষণ করেছে। ড. ব্রাউন যদি কোনোভাবে তার বন্দিকারীদের ওপর গুলি চালাতেন, আমেরিকায় তিনি একেবারে হিরো হয়ে যেতেন। বাকি জীবনটা তাকে সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কাটাতে হতো না। আমার বিশ্বাস, ড. আফিয়া সিদ্দিকী একজন রাজনৈতিক বন্দি এবং দুই সরকারের আমল (বুশ-ওবামা) জুড়ে একজন রাজনৈতিক জুজু হয়ে আছেন।

রায়ের পর তার নিজ দেশে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াই দেখা গেছে৷ ব্যাপক গণআন্দোলন, আমেরিকার পতাকা পোড়ানো, ওবামার কুশপুত্তলিকা দাহ করা এবং আফিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারকে বারবার বলা হয়েছে সেখানে৷ তারা জানে কে আসল সন্ত্রাসী, কাকে আসলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত৷ এখন হিলারি ক্লিনটনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নমনীয় ক্ষমতার কূটনীতি অবলম্বনের বাঁশি বাজাচ্ছে৷ অথচ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিমদের মন থেকে সমস্ত ক্ষোভ দূর করাই বরং এসব সস্তা কথাবার্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ৷

আমেরিকাতে অনেকেই এখনও ড. সিদ্দিকীর ঘটনা সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না৷ বহু লোকই আশায় বুক বেঁধেছিল যে ওবামা প্রশাসন অন্তত বুশের আমলের চাইতে স্বচ্ছ হবে৷ কিন্তু আমার মনে হয় তারা বড্ড ভুল করেছিলেন৷

-সিনডি শিহান

(সিনডি শিহান ৪ঠা এপ্রিল ২০০৪ সালে ইরাকে নিহত বিশেষজ্ঞ ক্যাসি এ. শিহানের মা৷ তখন থেকেই তিনি মানবাধিকার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার একজন কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন৷ এখন পর্যন্ত তিনি পাঁচটি বই প্রকাশ করেছেন৷ তার নিজের শো সিনডি শিহান’স সোপবক্স সম্প্রচারিত হয় রেডিওতে৷ তিনি শান্তিতে নোবেল পুরষ্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিলেন৷ সিনডি বর্তমানে অকল্যান্ডে বসবাস করছেন৷ ভালোবাসেন তার তিন নাতি-নাতনীর সাথে সময় কাটাতে৷)

২৩ সেপ্টেম্বরের নোট

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০। বুধবার। নিউইয়র্ক কোর্ট আফিয়াকে ৮৬ বছরের কারাদন্ড দেয়। জেলা জজ রিচার্ড এম বারম্যানের সাজা আমাকে অবাক করেনি। আমরা জানতাম তাকে কঠিন সাজাই শোনানো হবে। তাই পুরো মাস জুড়েই এই রায়কে কেন্দ্র করে আদালতে ব্যাপক বিক্ষোভ-সমাবেশ করার ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছিলো।

অন্যায়ভাবে আফিয়াকে সাজা দেবার পর আমরা জানতাম যে, আমাদের সরকারের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত। সরকারকে জানানো উচিত যে, আমেরিকার বিচারব্যবস্থার ইতোমধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে। জজ বারম্যান আগে থেকেই ঠিক করে রাখা রায় শোনালে আফিয়ার শাস্তি হতে পারতো মৃত্যুদণ্ড, যে মানুষটার জীবনের সাড়ে সাত বছর ইতোমধ্যেই পার হয়ে গেছে কারাগারের নরকে।

আমাকে যেটা অবাক করেছে সেটা হচ্ছে জজ রিচার্ড বারম্যান কি বাজে ভাবেই না এই নাটক মঞ্চস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার নষ্ট বিচারব্যবস্থাকে সে একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সে আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমেরিকা হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শুধু আইন আছে কিন্তু কোনো বিচার নেই।

রায় ঘোষণার সময় আমার পর্যবেক্ষনের নোটের সারসংক্ষেপ এই লেখাটি।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০

বুধবার সকাল বেলা। নিউইয়র্কের আদালতে জজ বারম্যান হেঁটে হেঁটে প্রবেশ করলেন। এরপর আফিয়ার মামলার ধারাগুলো বর্ণনা শুরু করলেন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটাও সে নোট করলো যে ২০০৮ এর জুলাইয়ে আফগানিস্তানে আফিয়ার খোঁজ

পাওয়ার ব্যাপারটা কখনোই খোলাসা করা যাবে না। বারম্যান নানারকম জল্পনা কল্পনা করছিল আফিয়ার আফগানিস্থানে থাকার সম্ভাব্য কারণের ব্যাপারে, কিন্তু আফিয়াকে যে অপহরণ করে আফগানে নেওয়া হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা ভুলেও সে একবারও উচ্চারণ করলো না। (আমি বলব এটি ইচ্ছাকৃত ভুলের জ্বলন্ত উদাহরণ)

বারম্যান বলছিল ২ পাউন্ড সোডিয়াম সায়ানাইড, মার্কিন বিভিন্ন স্থাপনা চিহ্নিত করা কিছু ইংলিশ আর উর্দু দলিলপত্র এবং সন্ত্রাসী হামলার জন্য কিছু জিনিস, যেগুলো নাকি আফিয়া তাঁর ব্যাগে বহন করছিলেন। (আফিয়া এই ব্যাগের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। পাঁচ বছরের ভয়াবহ অত্যাচার থেকে আফগানিস্তানের মাটিতে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার পর বিধ্বস্ত ও চরম দুর্বল অবস্থায় এই ব্যাগটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।)

এই বিচার চলাকালীন এমন কিছু ইস্যু আর বক্তব্য উত্থাপিত হয়, যেগুলো এই পর্যবেক্ষকের মনে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য প্রশ্নের।

সরকারের দাবি, আফিয়া আফগানে থাকার সময় দুইবার পালানোর চেষ্টা করেন। তার কাছ থেকে নাকি বেশ কিছু সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। তবুও তাকে পুলিশ চৌকিতে ছেড়ে রাখা হয়েছিল স্রেফ পর্দার আড়ালে থাকা একটি রুমে! তাও আবার কোনো বন্দি অবস্থায় না! কেনো? নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবস্থান থেকে এই কাহিনী কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়?

বারম্যান তার সুবিধামতো একবার আফিয়া সিদ্দিকীর মানসিক অবস্থার দুর্দশা নিয়ে কথা তুলছিল। আবার ইচ্ছামত ব্যাপারটাকে এড়িয়েও যাচ্ছিলো। সে আরো নোট করে নিউইয়র্কের এই ট্রায়াল শুরু হবার আগে আফিয়াকে ঘন ঘন নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবস্থান থেকে এই কাহিনী কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়?

বারম্যান তার সুবিধামতো একবার আফিয়া সিদ্দিকীর মানসিক অবস্থার দুর্দশা নিয়ে কথা তুলছিল। আবার ইচ্ছামত ব্যাপারটাকে এড়িয়েও যাচ্ছিলো। সে আরো নোট করে নিউইয়র্কের এই ট্রায়াল শুরু হবার আগে আফিয়াকে ঘন ঘন নিরাপত্তা তল্লাশির শিকার হতে হয়েছে। এই নিরাপত্তা তল্লাশি ছিল মূলত নগ্ন তল্লাশি, যা মধ্যে শরীরের বিভিন্ন গোপন স্থানে হাত ঢুকিয়ে তল্লাশিও করা হয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কারাগারে। সেখানে তাঁকে বারবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিয়ে যাবার পরই এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে কোনো কারণ ছাড়াই। স্রেফ এই একটা অত্যাচারই যথেষ্ট একজন ভদ্র মহিলাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে দেবার জন্য, বিশেষ করে হিজাব পরিধানকারী একজন মুসলিম মহিলাকে।

জজ বারম্যানের আদালত আফিয়াকে পুরো সাতটি ধারায় অভিযুক্ত করে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আফিয়া আদালত চলাকালীন এটা বলে যে, তার বিশ্বাস ৯/১১ এর হামলা ইসরাইল করেছিল এবং ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে (যেখানে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল) এক কর্মী আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

জজ বারম্যান আরো অভিযোগ করে, আফিয়ার বড় ছেলে আহমেদ তার মুক্তির পর থেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। সে আরো বলে, আফিয়ার সাবেক স্বামী আমজাদ খান দাবি করেছে যে, নিখোঁজ থাকাকালীন সে আফিয়াকে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে। ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আফিয়া কোথায় ছিলেন সে ব্যাপারে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেকর্ড নেই, এটাও সে বারবার বললো। (সন্দেহাতীতভাবে সরকারের অনুরোধে এই কাজটা সে নিজেই করেছে।)

বারম্যান আরো উল্লেখ করে যে, কোনো এক প্রফেসর এর দেওয়া তথ্য মতে (যার নামটা আমাকে দেওয়া হয়নি), বোস্টনে থাকাকালীন নাকি আফিয়া উগ্রপন্থার সংস্পর্শে আসেন। এরপরে বলেন কিভাবে এই মামলা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন তিনি। জুরিবোর্ডের একজন সদস্যকে মামলার কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এই কারণে যে কোর্টরুমে একটি লোক হুমকিমূলক অঙ্গভঙ্গি করছিল যতক্ষণ না ইউএস মার্শালরা তাকে কোর্টরুম থেকে সরিয়ে না নিয়ে যায়। (এবং এই লোকটাকে গ্রেফতার তো করা হয়নি, উল্টো তাকে আবার কোর্টরুমে ফিরে আসতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।)

আমার মতো আদালতে উপস্থিত অনেকের মতেই, এই অপরিচিত লোকটি ছিল (যাকে আর কখনো মিডিয়ায় দেখা যায়নি) সরকারের সাজানো নাটকের অংশ। যার উদ্দেশ্য ছিল জুরি সদস্যের মধ্যে আসামির প্রতি বিদ্বেষ রোপণ করে দেওয়া। একই ভাবে আমরা এটাও মনে করি যে, আদালতে নাটকীয়ভাবে সাক্ষ্য দেওয়া সেই সৈন্যও এই পরিকল্পনার একটা অংশ ছিল। আমার বিশ্বাস সেই ব্যক্তি ছিল ক্যাপ্টেন রবার্ট স্নাইডার।

ডিফেন্স এটর্নি ডন এম কার্ডি সম্মানের সাথে এই মামলাকে কেন্দ্র করে জজ বারম্যান যেসব তথাকথিত 'তথ্য' প্রদান করে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। কার্ডি জানান যে, তাকে কীভাবে অতি গোপনীয়তার সাথে ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় কিছু "টপ সিক্রেট" ডকুমেন্টস পাওয়ার জন্য যা ছিল খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধুমাত্র এটাই শোনার জন্য যে, "এই কেইস সংক্রান্ত কোনো ক্লাসিফাইড প্রমাণ নেই!"

কার্ডি বলেন, আফিয়া মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। তার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার পর কার্সওয়েল কারাগারে রাখা হয়েছিল তাকে। সেই কারাগারের এক বিশেষজ্ঞের মতে, আফিয়াকে আমেরিকায় নিয়ে আসার পর

প্রথম কয়েক মাস শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিলো। খুব সম্ভব আফিয়া সিজোফ্রেনিয়াতে ভুগছেন।

কার্ডি সরকারের অভিযোগের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, সরকার আফিয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতাকে আমেরিকার জন্য হুমকি হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। (তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বায়োলজিকাল ওয়েপন বানিয়ে আমেরিকায় হামলা চালাবেন)। অথচ আফিয়া বায়োলজিস্টই নন। যে বিষয়ের উপর তিনি উচ্চতর গবেষণা করেছিলেন তা হচ্ছে “কিভাবে শিশুরা শিখে”। কার্ডি আরো উল্লেখ করেন, আদালতে আফিয়ার বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত কোনো অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি (যা বারম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল)।

কার্ডি আরো উল্লেখ করেন উইকিলিকসের তথ্য মতে, আফিয়াকে যখন গুলি করা হয় তখন আফিয়া বন্দুকটি (এম ৪ রাইফেল) নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কার্ডিকে আদালত বলেন, “আদালতের দণ্ডাদেশের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন চলবে না।” তখন কার্ডি জোর দিয়ে বলেন, এখানে রায়ের ব্যাপারে অবশ্যই প্রশ্ন আছে। তিনি এই মামলায় আতঙ্কের ব্যবহার নিয়ে কথা বলেন। কার্ডি কোনো ধরনের সময় বাড়ানো ছাড়া সর্বোচ্চ ১২ বছরের সাজা দাবি করেন।

সরকারের সমাপনী যুক্তির সারাংশ উঠে এসেছে লিড প্রসিকিউটর, ইউএস এসিস্ট্যান্ট এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিনের এই কথাগুলোতে, “এই আদালতের ভেতর যে ভয়ের কথা বলা হচ্ছে, তা এমনি এমনি আসেনি। বরং তা মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন স্লাইডারের জবানবন্দিতে উঠে এসেছে যখন সে একটি লোড করা বন্দুকের ব্যারেল বরাবর তাকিয়েছিল ও ভাবছিল যে সে এখনই মারা যাবে। সেটা (ইউএস পার্সোন্যাল এর উপর আফিয়ার সেই আক্রমণের তথাকথিত অভিযোগের ব্যাপারে বলছে) কোনো

উলটাপালটা কাজ ছিল না। বরং সেদিন সে (আফিয়া) সুযোগ পেয়েছিল এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিল।”

আমার মতামত হলো, এই মামলাকে ঘিরে সকল দুর্বল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আফিয়ার পক্ষে থাকার পরেও উপরের বর্ণনাটি সফল ছিল ও মামলার রায় আফিয়ার বিপক্ষে যায় তিনটি কারণেঃ

১। মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় ধারাবাহিকভাবে যে চেহারায় এই মামলাকে উপস্থাপন করা হচ্ছিলো।

২। আফিয়াকে নির্দোষ প্রমাণ করার মতো কিছু স্বাক্ষ্যপ্রমাণগুলির ব্যাপারে কোর্টের বাধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত।

৩। আফিয়ার উচ্চবেতনভুক্ত ডিফেন্স টিমের সেরকম তেজস্বী ডিফেন্স করতে না পারা, যেমনটা এইরকম রাজনৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

আফিয়ার আইনজীবীরা আফিয়ার মানসিক অবস্থার ব্যাপারটি জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন আদালতে; তখন জজ বারম্যান তাদের বাধা প্রদান (বিতর্কটি কীভাবে সুচারুভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেই লক্ষ্যে) করে যে আফিয়া আদৌ কতটুকু অসুস্থ তা নিয়ে সে সন্দিহান। আর যদি আফিয়া সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোনো দিন সুস্থ হবেন কিনা এটা নিয়েও প্রশ্ন তোলে সে।

আফিয়া দৃঢ়তার সাথে তাঁর আইনজীবীর এই কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আমি মানসিক বিকারগ্রস্ত নই৷ আমি মোটেও মানসিক ভাবে অসুস্থ নই৷ আমি আপনাদের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষন করছি!”

(যদিও এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের বোনের মনের অবস্থা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মার্কিন নির্যাতনে৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আফিয়া সিদ্দিকী এই রুগ্ন অসুস্থ দুনিয়ায় সুস্থ একজন মানুষ৷ বারম্যান বলছিল আফিয়া কীভাবে বারবার ‘কর্তৃপক্ষ’ কে সহায়তা করায় ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু সে একবারের জন্যেও বলেনি আফিয়াকে যে অবস্থায় কারাগারে রাখা হয় সে ব্যাপারে; যা আফিয়ার ‘সহযোগিতা’ করতে ব্যর্থতার মূল কারণ৷)

কোর্টে আফিয়ার জবানবন্দি

আফিয়া শুরু করেন তাঁর এই ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে যে, আজকে এখানে কি হতে চলেছে তা নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তিত নন৷ বরং তিনি তাঁর তাকদীরের উপর বিশ্বাসী৷ আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর তাকদীরে যা লিখেছেন তাই হবে৷ আর তিনি এখন নির্যাতিত হচ্ছেন না৷ খেয়াল করুন, তিনি কিন্তু বলেননি যে তিনি কখনোই নির্যাতিত হননি, তিনি বলেছেন এই মূহুর্তে তিনি নির্যাতিত হচ্ছেন না৷

(আমরা যারা এই কেইসটির ঘটনাক্রম সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছি তাদের কাছে এটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আমরা জানি আফিয়ার উপর মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের গোপন কারাগারে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে৷ আমরা এ ব্যাপারেও সমানভাবে সচেতন যে, আফিয়া বিনা বিচারে আমেরিকাতে দুই বছরের বেশি কারাবন্দি ছিলেন৷ যা আমাদের দেশের সংবিধানে “নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তির” বিরুদ্ধে গ্যারান্টির বিপরীত৷)

আফিয়া মি. ডেসমন্ড নামের একজনের বিরুদ্ধে আমেরিকার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। (আমার বিশ্বাস এটি মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফল, আল্লাহ ভালো জানেন)

সে আবার উল্লেখ করে কিভাবে তাকে আমেরিকার গোপন কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছিল। যার ব্যাপারে স্বীকার করতে আমেরিকান সরকার শক্তভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আফিয়া কিছু সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে বলেন যারা হিস্পানিকদের ছদ্মবেশে আমেরিকার ক্ষতি করতে চাইছে এবং কিভাবে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের বংশপরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব এটাও তিনি জানান। আফিয়া আরো বলেন, তিনি সব ইসরাইলীদের বিপক্ষে না, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে, যা নিন্দনীয়।

তিনি এক সময় কিছুটা নরম সুরে বলেন, তাঁর মুখের বেশীরভাগ দাঁতই আসল নয়। তাঁর উপর গোপন কারাগারে নির্যাতন সহ্য করতে গিয়ে এই দাঁতগুলো হারান তিনি। আফিয়া এটাও বলেন যে কিভাবে একজন ডাক্তার তাঁর মধ্যে “পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার” রোগের লক্ষণ প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করে, কিন্তু পরবর্তীতে তাকে চাপ প্রয়োগ করা হয় তার রিপোর্ট বদলাতে; এর পরিবর্তে বলতে বলা হয় “আফিয়া সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত।”

আফিয়া বলেন, এফবিআই যা শুনতে চায় তাই তিনি তাদেরকে শুনিয়েছিলেন এই আশায়, যাতে করে তিনি আবারো তাঁর সন্তানদের ফিরে পান। ড. আফিয়া জোর দিয়ে বলেন, তিনি সব রকমের যুদ্ধের বিপক্ষে।

তিনি রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে স্বপ্নে দেখার কথা বলেন। তিনি তালেবানকে উপদেশ দেন তারা যেন সদয় হয়। তিনি ব্রিটিশ জার্নালিস্ট ইভন রিডলির আটক হওয়া ও এর পরবর্তী কথোপকথনের ব্যাপারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তাঁর স্বপ্নে তিনি রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে আমেরিকান সৈন্যদের একটি রুমে প্রবেশ করতে দেখেন যেখানে তারা যুদ্ধবন্দি ছিল। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাদেরকে জ্ঞানগর্ভমূলক উপদেশ দেন। আফিয়া আমেরিকান সৈন্যদের ঘৃণা না করার পরামর্শ দেন মুসলিমদের।

তিনি ইসরাইলী-আমেরিকানদের ব্যাপারেও বলেন (যা আমাকেও অবাক করে), যাদের কাছে তার মেয়ে অনেক বছর ছিল এবং তারা কখনই তাকে ধর্ষণ করেনি। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাকে কি এসব ব্যাপারে বলতে বলা হয়েছে নাকি তিনি এরকম করছেন সাইকোলজিক্যাল কোপিং মেক্যানিজমের কারণে? (আল্লাহ ভালো জানেন)

একটু পরেই আফিয়া আবেগে ভেঙ্গে পড়েন (আমি বুঝছিলাম যে মূল এবং অতিরিক্ত কোর্টরুমের অনেকেই কিছুটা শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিল)। তখন তিনি বর্ণনা করেন একজন মায়ের জন্য তার সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কত কষ্টের! এমনকি তিনি এটাও জানতেন না তাঁর সন্তানরা কোথায় আছেন।

জজ বারম্যান এর হুকুম (অথবা সে যেটাকে হুকুম বলে মনে করে)

জজ বারম্যান আফিয়াকে এই ধরনের বর্বরোচিত সাজা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে। তার কথার সারমর্ম হলো, আপাতদৃষ্টিতে আফিয়ার পুনর্বাসন অসম্ভব। এসব বলার মাধ্যমে সে জোর দিয়ে আফিয়ার উপর এই সাজা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাফাই গায়।

১। সে আফিয়া সিদ্দিকীকে “ঘৃণা ছড়ানোর” অপরাধে অভিযুক্ত করে। কেননা আফিয়ার কথিত হামলার শিকার একজন আমেরিকান।

২। আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তাকে হত্যা চেষ্টার অপরাধ উত্থাপন করা হয়। কেননা কথিত হামলার শিকার একজন সরকারি কর্মকর্তা।

৩। সন্ত্রাসবাদের প্রসারের অভিযোগ আনা হয়। কেননা তাঁর উপর অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি বা সরকারকে শাস্তি দেওয়া। (এটা মনে রাখা দরকার যে, আফিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটিও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযুক্ত করা হয়নি, তারপরেও তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী ধারা যুক্ত করা হয়। বারম্যান দুর্বল অজুহাত দেখায় যে আসামির মনের ইচ্ছাও নাকি হিসেবনিকেশে আনতে হবে।)

৪। আফিয়ার বিরুদ্ধে জজ বারম্যান পুরনো অপরাধের রেকর্ডের ধারাও খুঁজে পায়। (আমি চেষ্টা করছি এর পিছনে বারম্যানের কুটিল যুক্তি খুঁজে বের করতে।)

৫। আফিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের কাজে বাধা প্রদানের ধারা সংযুক্ত করা হয়। কারন আফিয়া (বারম্যানের দৃষ্টিতে) আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৬। বারম্যান আফিয়ার বিরুদ্ধে অপরাধের পূর্ব-পরিকল্পনার ধারা যুক্ত করে। কারন অভিযুক্তের দাবি অনুযায়ী ২০০৮ সালে আফিয়া আমেরিকান এজেন্ট ও সৈন্যদের

দিকে এম ফোর রাইফেল তাক করে চিৎকার করে বলেন “আমি আমেরিকানদের হত্যা করতে চাই” এবং “আমেরিকা ধ্বংস হোক!”

পরবর্তীতে, সে এই মামলার রায় দেওয়া নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে এটা বোঝাতে কিংবা বিদ্রূপ করে বলেঃ

“আমরা দণ্ডাদেশ একসাথে দিবো নাকি ক্রমান্বয়ে?”

সত্য বলতে জজ বারম্যান একজন মিষ্টভাষী মুসলিমবিদ্বেষী, মামলা বিরুদ্ধ গোঁড়ামিতার সুন্দর একটি উদাহরণের বেশি কিছুই না। এই মামলার সব থেকে তীব্র মূল্যায়ন করেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ব্রুস রাইট, তারই কিছু সঙ্গী বিচারকদের ব্যাপারে যারা বেঞ্চে ছিল। সে এই মামলাকে অভিহিত করে “Black Robes, White Justice” বলে।

জজ বারম্যানের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক মূহূর্ত ছিল যখন সে “আফিয়া এম ফোর দিয়ে গুলি চালিয়েছিলেন কিনা” এটা নিয়ে আলোচনা করছিল। তখন আফিয়ার আইনজীবী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আফিয়া গুলি চালিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ জুরি পায়নি। তখন জজ বারম্যান আমতা আমতা করে বলে ওঠে সে নাকি প্রমাণ পেয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদন্ডের (৮৬ বছর) পরেও আফিয়া ছিলেন বিশ্বাস আর দয়ার মূর্তপ্রতীক। এরপর আবারও তিনি তার পিছনে বসে থাকা সাক্ষীদের দিকে ঘুরে তাকান এবং আদালতে উপস্থিত মুসলিমদের আবেগপ্রবণ না হওয়ার পরামর্শ দেন।

বিচার চলাকালীন আফিয়া বিচারকের পক্ষপাতের ব্যাপারে একবার অভিযোগ করেন, যা এই মামলার শেষাংশে এসে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠে (যখন বারম্যান তালিকাভুক্ত জুরিদেরকে বিচারিক বিতর্কের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়)। আফিয়া অভিযোগ করেন যে, বারম্যান অন্যান্য জুরিদের চাপ দিচ্ছিলো। রুমের ভেতরে কোনো অস্ত্র আফিয়ার হাতের নাগালে ছিল, এটা জানা গেলেই যেন এর উপর ভিত্তি করেই তাঁকে অস্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা একজন বিচারকের বাজে অজুহাতের সাথে তীব্রভাবে সাংঘর্ষিক। আফিয়া নিশ্চিতভাবেই এখানে মানসিক ও আধ্যাত্মিক, দু'দিক থেকেই বারম্যান আর তার সঙ্গী বিচারকদের থেকে অনেক উপরে অবস্থান করছিল। এই অনুশোচনীয় প্রক্রিয়াটিকে আদর করে বলা হয় "কোর্ট অফ ল"।

বারম্যান যখন তার রায় ঘোষণা করে, তখন মূল বিচারকক্ষ থেকে এক পরিচিত নারীকন্ঠের তীব্র চিৎকার শুনতে পেলাম, "ধিক্কার! ধিক্কার এই আদালতের ওপর!" (আমি তখন ভিড়ের কারনে আদালত কক্ষের বাইরে বড় পর্দায় আদালতের কার্যক্রম দেখছিলাম)। তাকে বিচারকক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় এবং আমি জানতে পারি সে আমার পরিচিত একজন বন্ধু "ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার" এর সদস্য, সারা ফ্লাউন্ডার্স।

এরপর বারম্যান তার 'উদ্বেগ' প্রকাশ করে এই ব্যাপারে যে, আফিয়াকে তার মানসিক প্রতিকূলতার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা নেই। যদিও সে নিজে আগেই তার বিশ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছেঃ

১। সে মনে করে আদৌ সে মানসিক ভাবে অসুস্থ নয়।

২। আর যদি সে সত্যি সে অসুস্থ হয়েই থেকে তাহলে কোনো থেরাপি তার কাজে আসবে না, কারন অতীতে আফিয়া এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেনি। (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বারম্যান নিজের যুক্তিতর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুবিধামতো আফিয়ার মানসিক অসুস্থতার কথা সময়ে সময়ে স্বীকার ও অস্বীকার করে গিয়েছে।)

এরপর যা ঘটলো তা ছিল বিশ্বাস আর আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতার এক বড় পাঠ। আফিয়া আদালতে উপস্থিত সবাইকে এবং পরে যারা এর খবর শুনবে, তাদের সবাইকে এই মামলার সাথে জড়িত প্রতিটি মানুষ এমনকি বিচারকদের প্রতিও রাগ না রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

“এটা মুসলিমদের চমকে দেবেঃ আমিও আমেরিকাকে ভালোবাসি..... আমি পুরো বিশ্বকে ভালোবাসি.........। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আর আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার এই মামলার সাথে জড়িত সবাইকে ক্ষমা করে দিন......... এই দুনিয়া অবিচারে পরিপূর্ণ...... আর জজ বারম্যানকেও দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। আমি কোনো রক্তপাত চাই না.... আমি শান্তি চাই, চাই অবসান হোক সকল যুদ্ধের।”

এটাই ছিল সেদিনের ৩৮ বছর বয়সী, লম্বা সময় ধরে নির্যাতিতা এক মুসলিম নারীর কিছু নাসীহাহ (আন্তরিকভাবে দেওয়া পরামর্শ/উপদেশ)। বারম্যান দুর্বলভাবে আফিয়ার এই ভালো কামনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং বলে যে তার ইচ্ছা যেন সব আসামিরা এরকমই হয় (আসলেই?!)।

যখন বারম্যান জানায় যে আসামীপক্ষের এই রায়ের ব্যাপারে আপিল করার অধিকার আছে, তখন আফিয়া জবাব দেন এই বলে, “আমি আমার রবের কাছে আবেদন জানিয়েছি এবং তিনি আমার কথা শোনেন।”

- আলহাজ্জ্ব মাউরি সালাখান

তিন অভিযুক্ত নারীর গল্প

সন্ত্রাসী মামলার তিনজন নারী আসামীকে নিয়ে করা একটি তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় আমেরিকার বিচারব্যবস্থা কতটা স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালীপনায় পূর্ন। আমেরিকান এ্যামান্ডা নক্স, ক্যাসি এ্যান্থনি এবং পাকিস্তানি ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে নিয়ে এই পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় আমেরিকার জনসাধারণের সামগ্রিক ধারণাতেও তাদের বিচারবিভাগ কতটা ত্রুটিপূর্ণ।

এই তিনজনের ঘটনায় জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ, ধর্ম এবং রাজনীতিও যে প্রায়ই পশ্চিমাঞ্চলের বিচারপ্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে সেটাও খুবই স্পষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এ্যামান্ডা নক্স ইতালিতে গ্রেফতার এবং বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাথে ছিল তার ইতালীয় প্রেমিক এবং আফ্রিকা থেকে আসা এক অভিবাসী। তাদের বিরুদ্ধে এক বিদেশী ছাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ ছিল। রায়ে নক্সকে ছাব্বিশ বছরের জেল দেওয়া

হয়৷ এখন ইউরোপিয়ান আইনের (আমার মতে যা কিনা আমেরিকার আইনের তুলনায় বহুগুণে উত্তম) স্বয়ংক্রিয় আপিল প্রক্রিয়ায় একজন বিচারক সম্প্রতি পুনরায় নিরপেক্ষভাবে ফরেনসিক এভিডেন্স বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন৷ কারণ এর আগে ইতালীয় তদন্তকারীরা যে ময়নাতদন্ত করেছিলেন সেটা পক্ষপাতী হওয়ার ব্যাপারে জনশ্রুতি আছে৷ ফলে নক্সের সামনে নিকটভবিষ্যতে খালাস পেয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আছে৷

(বাজিকর হলে, নক্স যে আইনত'ই নির্দোষ প্রমাণিত হবে এবং আগে হোক পরে হোক আমেরিকায় ফিরে যাবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্তে বাজি ধরতাম৷) বিঃ দ্রঃ ২০১১ সালে মুক্তি পান নক্স৷

ক্যাসি এ্যান্থনি হলো ফ্লোরিডার এক তরুণী৷ তার বিরুদ্ধে নিজ সন্তান কেইলি এ্যান্থনিকে হত্যা করার অভিযোগ ছিল৷ প্রাণঘাতী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণাদি থাকার পরেও সম্প্রতি এ্যান্থনিকে আমেরিকার আইনের সবচাইতে মারাত্মক হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়৷ আর তদন্তকারী সংস্থাকে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগেই শুধু অভিযুক্ত করা হয়৷ এ্যান্থনি এখন মুক্তি পেয়ে এক গোপন স্থানে আছেন এবং যখন খুশি তখনই নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে নিতে পারেন৷

ড. আফিয়া সিদ্দিকী আঠারো বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আমেরিকায় আসা এক পাকিস্তানি ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী৷ ইউনিভার্সিটি অব হাউস্টন, এমআইটি এবং ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটিতে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি৷ এ ছাড়া তিনি নিজ এলাকায় মুসলিম ছাত্রদের সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে এবং বৃহত্তর বোস্টনে বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ করে আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন৷ পরবর্তীতে (৯/১১ এর পরে) আফিয়া পাকিস্তানে ফিরে যান এবং সন্দেহের তালিকায় ঢুকে পড়েন৷ কিছুদিন বাদে, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তার তিন সন্তানসহ এক নাটুকে অভিযানে গ্রেফতার হন৷

পাঁচ বছরের গোপন কারাবাস এবং ব্যাপক নির্যাতনের পর, অলৌকিকভাবে দুর্বল, ভেঙে পড়া আফিয়ার খোঁজ পাওয়া যায় আফগানিস্তানের এক প্রদেশে। এর কিছুদিন পর তিনি এক জিজ্ঞাসাবাদের আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। ২০০৮ সালে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হয়। অবশেষে দুই বছর পরে আফগানিস্তানে আমেরিকান নাগরিককে 'হত্যাচেষ্টা'র অভিযোগে তার বিচার শুরু হয়।

এ্যামান্ডা নক্স আর ক্যাসি এ্যান্থনিকে নিয়ে যখন পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে একের পর এক প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছিল, যখন তাদের বিচারকার্য রিয়েলিটি শো এর মতো জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছিল, তখন ড. আফিয়ার মামলাটি প্রায় অজ্ঞাতে নিষ্পত্তি (!!) করা হয়েছে। যদিও তার রায়ের দিন আদালতকক্ষে প্রচুর সাংবাদিক উপস্থিত ছিল, তবুও খুব বেশি কিছু আমরা তাদের কাছ থেকে জানতে পারিনি।

নক্স আর এ্যান্থনি তদন্তকারীদেরকে ভুল তথ্য (স্পষ্ট করে বললে, মিথ্যে তথ্য) দিয়েছিল। অথচ আফিয়া শুরু থেকে শেষ অবধি স্পষ্ট ভাষায় সবকিছু জানিয়েছেন। নক্স এবং এ্যান্থনি চাচ্ছিল তাদের অপরাধের দায় নির্দোষ কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, যদিও তাদের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণাদি উপস্থিত ছিল। অন্যদিকে ড. সিদ্দিকীর ক্ষেত্রে, বাহ্যিক এবং পরোক্ষ প্রমাণাদি উভয়ই তার পক্ষে ছিল; বরং সরকারী সাক্ষীরাই মিথ্যা হলফ করে সাক্ষ্য দিয়েছিল। (যদিও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় কোনো অভিযোগ গঠিত হয়নি।)

বিচারক ক্যাসি এ্যান্থনিকে অন্যায়ভাবে আগে আগেই নির্দোষ ঘোষণা করে, কারণ সে দেখেছিল যদি ন্যায়বিচার করা হয় তাহলে একজন শ্বেতাঙ্গী তরুণী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হবে। (আমার ধারণা, বিনা প্রমাণ উত্থাপনে দেওয়া এই 'নির্দোষ' রায় তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন

করার পর খুব তীব্রভাবে ব্যাকফায়ার করবে।) যেখানে মিস এ্যান্থনি তার বিচারের জন্য জজ বেলভিন পেরি'র মতো একজন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচারক পাচ্ছে, ড. আফিয়া পেয়েছেন ঠিক তার বিপরীত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ রিচার্ড বারম্যান খোলাখুলিভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে।

এ্যান্থনির জুরিরা হোটেলের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে ছিল, যেখানে উচিত ছিল আফিয়ার জুরিদের থাকা। অথচ আফিয়ার জুরিরা প্রতিদিন আদালত থেকে চলে যেতেন এবং এই মামলার বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যমে খোলামেলা আলোচনা করতেন। আর এই মামলা নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে নানা রকমের বিষাক্ত সংবাদ প্রচার হতে থাকে যা এই মামলার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। এ্যান্থনির আইনজীবীদের যেখানে তার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আফিয়ার ক্ষেত্রে তার আইনজীবীদের সব সময় চাপের উপর রাখা হয়েছে।

যেখানে ক্যাসি এ্যান্থনি স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এ্যামান্ডা নক্সকে মার্কিন গণমাধ্যম সাদরে গ্রহণ করেছে, হয়তো সেও খুব শীগ্রই মুক্তি পাবে। সেখানে আফিয়া সিদ্দিকী যে কিনা কারো কোনো ক্ষতি করেনি তাকে ২০১০ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে!! আফিয়া বর্তমানে টেক্সাসের সেনাবাহিনীর কারাগারে এই সাজা ভোগ করছে।

বিখ্যাত মানবাধিকার কর্মী সিনডি শিহান আফিয়ার সাজা হবার কিছু দিনের মাঝেই একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন,

“যদি ড. সিদ্দিকী সেই মার্কিনীগুলোকে গুলি করতেনও, তাহলে কী হতো? ধরুন ড. বেটি ব্রাউন নামের কোনো এক আমেরিকান নারীকে আইএসআই গ্রেফতার করে একইভাবে নির্যাতন, ধর্ষণ করেছে। ড. ব্রাউন যদি কোনোভাবে তার বন্দিকারীদের ওপর গুলি চালাতেন, আমেরিকায় তিনি একেবারে হিরো হয়ে যেতেন। বাকি জীবনটা তাকে সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কাটাতে হতো না।

আমার বিশ্বাস, ড. আফিয়া সিদ্দিকী একজন রাজনৈতিক বন্দি এবং দুই সরকারের আমল (বুশ-ওবামা) জুড়ে একজন রাজনৈতিক জুজু হয়ে আছেন।”

এখানে আমি আর একমত হতে পারছিনা........আর এখানেই তিন জন অভিযুক্ত নারীর আর আমেরিকার ‘ন্যায়বিচারের’ গল্পের সমাপ্তি।

আলহাজ মাউরি সালাখান

মানবাধিকার কর্মী, এডভোকেট, কবি ও লেখক

৭ই আগস্ট ২০১১।

ওবামার কাছে আফিয়ার মায়ের চিঠি

বারাক ওবামা

প্রেসিডেন্ট

হোয়াইট হাউজ

ওয়াশিংটন, ডিসি ২৯৫০০

মি. প্রেসিডেন্ট,

আমার নাম ইসমাত সিদ্দিকী। ড. আফিয়া সিদ্দিকী আমার কন্যা। সে এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে আপনি ইতোমধ্যে হয়তো শুনে থাকবেন। সম্ভবত, তার সম্পর্কে নেতিবাচক কিছুই শুনে থাকবেন। ইন্টারনেট ও অন্যান্য মাধ্যমে লাখ লাখ পৃষ্ঠা একজন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুমিত বিবরণ, প্রশংসা, কটাক্ষমূলক ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং একই সাথে একগাদা প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তার সমর্থকেরা তাকে সেইন্টহুডে তুলে এনেছে। আর কুৎসাকারীরা তাকে অপবাদ দিয়ে দানবে রূপায়িত করেছে। একজন মানুষ সম্পর্কিত সত্যটি এর মধ্যে হারিয়ে গেছে। আসল ঘটনা হচ্ছে, আফিয়া তিন-তিনটি সন্তানের মা এবং একজন মেধাবী মুসলিম মহিলা। তার একমাত্র উৎসাহ-অনুরাগ হচ্ছে লোকদের শিক্ষিত করে তোলা। এজন্য সে পড়াশোনা করেছে বিশ্বের উৎকৃষ্ট সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এগুলোর মধ্যে আছে এমআইটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোও। ২০০১ সালের ১ সেপ্টেম্বরের পর অজানা কারণে আফিয়া সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের এক শিকারে পরিণত হয়েছে।

এটি শুধু তার অসুস্থ মায়ের একটি দুঃখজনক কাহিনীই নয়। এটি সেইসব মানুষের দ্বারা নির্যাতন, অন্যায় মর্যাদাহানি, অবনমিত করা, প্রতারণা ও বর্বরতার এক বাস্তবতা- যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি সভ্য বলে দাবি করেন। এটি তাদের করা গুরুতর এক অন্যায়-অবিচার, যারা নিজেদের সবচেয়ে ন্যায়ানুগ বলে দাবি করেন। এটি একটি জাতির পক্ষপাতদুষ্টতার এক মহাকাব্য, যে জাতি তা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে দাবি করে থাকে। এটি শুধু একজন নারীর কোনো অগ্নিপরীক্ষা নয়; এটি একটি জাতির অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি জাতি ও এর শাসকদের ওপর

কালিমা লেপনের কাজ। মি. ওবামা, এটি আমেরিকার দু'টি প্রশাসনের 'লজ্জাকর উত্তরাধিকার'। আমি এই বিভৎস ঘটনা, এর মেরিট বা ডিমেরিট উল্লেখ করতে যাবো না, কারণ আমি নিশ্চিত- আপনার কাছে প্রবেশাধিকার পাওয়া উকিলেরা আপনাকে শুধু সেসব 'ফ্যাক্ট' জানাবেন, যা তাদের দাবিকেই যুক্তিযুক্ত করে তোলে। কিন্তু এই আশায় এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস নেটওয়ার্কের তৈরী একটি ফ্যাক্টশিট সংযোজন করছি যে, আপনি এক নজর তা দেখবেন যে এর একটি 'উল্টো পিঠ'ও আছে। আমাকে বলা হয়েছে, আপনি একজন মেধাবী আইনজীবী ছিলেন। হার্ভার্ডে আপনি ছিলেন আপনার সহপাঠীদের শীর্ষে। অতএব আমার আশা, আপনি কল্পকাহিনী থেকে সত্য বের করে নিয়ে আসতে পারবেন।

মি. প্রেসিডেন্ট, অপহরণের পর আমার মেয়েকে এই কয়েক বছর ধরে জোর করে তার সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা, তার ওপর নির্যাতন চালানো, গুলি চালানো, মারধর করা, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা এবং বিবস্ত্র করার ভাবনায় আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এমনকি, এখনো তার ডিটেনশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণ সৌজন্যবোধও মানা হচ্ছে না। বুলেটের ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছার পর এক মাস তাকে কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। তার আটককারীরা নিউইয়র্কে এবং ফোর্টওয়ার্থের কার্সওয়েল মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে আইনজীবীদের সাথে সহায়তা করতে হুমকি অব্যাহত রাখে, যাতে তা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়। তাকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয়, যেখানে নির্মম প্রতিশোধের ভয়ে পরিবারের সাথে দেখা করতেও সে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। ইতোমধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় পার হয়ে গেছে তার ১২টি বছর- পাঁচ বছরের গোপন বন্দিত্ব জীবন এবং প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন সাত বছরের বন্দিত্ব।

সতের বছর বয়সে আমার মেয়েকে আপনার দেশে পাঠিয়েছিলাম, যাতে এমন শিক্ষা গ্রহণ করে যা বিশ্বের আর কোথাও সম্ভব হতো না৷ তাকে সেই মূল্যবোধ শিখিয়েছিলাম- দয়ালু হতে ও ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজ করতে; প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং অসহায় মানুষকে সহায়তা দিতে৷ আমার মেয়েকে সেটাই শিখিয়েছিলাম, যা আমেরিকার অবস্থান৷ কিন্তু আমি অবাক হই, আপনারা যখন সে মূল্যবোধ ভুলে যান৷ যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া তার সন্তানেরা প্রশ্ন করে- কেন তাদের অপহরণ ও নির্যাতন করা হয়েছিল? কেন এদের দেশ এদের ওপর এমন আচরণ করল? আপনি কি এর জবাব দিতে পারেন?

আফিয়া শান্তি ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ৷ সে সন্ত্রাসী নয়৷ তার শিক্ষা এবং তার সন্তানের প্রতি আগ্রহসূত্রে সে হতে পারত বিশ্বের অন্ধকারতম কোনো কোণার একটি মেধাবী আলো৷ শৈশবের প্রথমাবস্থায় শিক্ষার্জনের ওপর তার গবেষণা সবখানে লাখ লাখ শিশুর জন্য সহায়ক হতে পারত৷ আমার কন্যা হতে পারত একটি বিশ্বসম্পদ, যে বিশ্বে তা আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি দরকার৷

আমি আপনার কাছে আর্জি জানাই, আপনার প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের এই সময়ের সবচেয়ে গুরুতর অন্যায়-অবিচারের রায়টিকে অকার্যকর করে দিন৷ এটা হবে এমন একটি পদক্ষেপ, যা মুসলিম বিশ্বে আপনার জন্য প্রচুর সুনাম বয়ে আনবে; যা লাখ লাখ ডলার খরচ করেও আনা সম্ভব হবে না৷ আপনার

একটি সাধারণ পদক্ষেপ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একজন মায়ের হৃদয় উষ্ণতায় ভরিয়ে দিতে পারে। আর তা ফিরিয়ে আনতে পারে আমেরিকার ক্ষমা ও করুণার উপায়। আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখুন একজন বাবা হিসেবে, যে এক কন্যাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে। আপনার গোয়েন্দা সংস্থা যা-ই বলুক, তা বিবেচনায় না নিয়ে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি- আমার কন্যা কারো জন্য কোনো হুমকি নয়। তাকে ছেড়ে দিলে শুধু আপনিই আরো শক্তিধর ও গৌরবোজ্জ্বল হবেন। কারণ, ক্ষমার প্রাপ্তি দ্বিগুণ। সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

-ইসমাত সিদ্দিকী

মার্কিন সরকারের প্রতি খোলা চিঠি

প্রিয় জনাব/জনাবা,

আমেরিকার রাজনীতির অন্যতম একটি স্লোগান হল, “ঈশ্বর আমেরিকাকে আশীর্বাদ করুন।” তখন প্রশ্ন উঠেঃ এই আশীর্বাদ বারবার পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার একটি নৈতিক দায়িত্ব জাতির উপর বর্তায় কিনা? আমরা বিশ্বাস করি উত্তরটা হচ্ছে, হ্যাঁ।

আমরা বিশ্বাস করি একটি জাতির চরিত্রের সবচেয়ে গুরুরত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে সেই জাতি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কিরকম পদক্ষেপ নেয় এবং এটা সেই জাতির জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আশীর্বাদের একটি ভালো লক্ষণ।

বিখ্যাত আলিম শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেনঃ “*সভ্যতা টিকে থাকে ন্যায়বিচারের উপর আর জুলুমের পরিণতি বিধ্বংসী। তাই বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করবেন, এমনকি যদি এটা কাফির রাষ্ট্র হয়। কিন্তু জালিম রাষ্ট্র থেকে তার সাহায্য উঠিয়ে নেবেন, যদি এটি মুসলিম রাষ্ট্রও হয়।*’ একই চেতনায় আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা থমাস জেফারসন তার একজন ঘনিষ্ঠজনকে তার মনের ভেতরে লালন করা গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন এভাবেঃ “আমি আমার দেশের জন্য ভয়ে কেঁপে উঠি যখন আমার মনে পড়ে যায় ঈশ্বর ন্যায়বিচারক। তার ন্যায়বিচার চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে থাকে না।”

পৃথিবীর অন্যতম শান্তিপূর্ণ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্প্রদায় আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি বিশেষভাবে ৯/১১ এর পর থেকে আমেরিকার বিচারের মান নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগের সপক্ষে আমরা অনেকগুলো কেইস দেখাতে পারব যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হল ড. আফিয়া সিদ্দিকীর কেইস।

ড. সিদ্দিকী একজন পাকিস্তানি নাগরিক যাঁর লেখাপড়া এবং পরিণত বয়সের বেশিরভাগ সময় কেটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন ১৮ বছর বয়সে। এমআইটি এবং ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। বিয়ে করে পরিবার জীবন এখানেই শুরু করেছিলেন। বোস্টনে থাকাকালীন যুক্ত ছিলেন প্রশংসনীয় দাতব্য কাজে। তার তিন সন্তানের মধ্যে দুইজন জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক।

আর হাজারো সক্রিয় মুসলিমের মতো ৯/১১ এর পর ড. সিদ্দিকীও সন্দেহের শিকার হন। ২০০৩ সালের মার্চে করাচি থেকে ইসলামাবাদে বসবাসরত তার মামাকে দেখতে যাবার সময় ড. আফিয়া সিদ্দিকী এবং তার তিনটি ছোট ছোট সন্তানকে জোরপূর্বক ট্যাক্সি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েক বছরের জন্য নিখোঁজ করে ফেলা হয়। তার সবচেয়ে ছোট সন্তানটি আজ পর্যন্ত নিখোঁজ!

২০০৮ এর জুলাইতে রহস্যময় কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার পর দুর্বল আর আলুথালু অবস্থায় আফগানিস্তানের গজনীতে আফিয়াকে গুলি করে এক আমেরিকান সৈনিক। এরপর আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করে তাকে অবৈধভাবে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাকে অভিযুক্ত করা হয় “আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য হত্যাপ্রচেষ্টার” অভিযোগে। তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় পুরোপুরি একটি অন্যায্য বিচারব্যবস্থায় যা ছিল আইনি অনিয়ম আর জালিয়াতিতে ভরা। তাকে দেওয়া হয় ৮৬ বছরের সর্বোচ্চ কারাবাসের শাস্তি। অথচ কথিত মার্কিন সৈন্য ‘হত্যাপ্রচেষ্টা’য় তিনি ছাড়া আর কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

ড. সিদ্দিকীর এই লাগাতার কারাবাস না দেশের বাইরে আমেরিকার ভাবমূর্তির উন্নতি ঘটাচ্ছে, না মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষকে আরো বাড়িয়ে তুলছে যখন কিনা আমেরিকা ও পাকিস্তান, দুই দেশের সরকারেরই উভয় দেশের জনগণের “হৃদয় ও মন” জয় করা এবং একইসাথে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মান অর্জন করা নিদারুণ প্রয়োজন।

ড. সিদ্দিকীর শারিরীক ও মানসিক অবস্থার যত বেশি অবনতি ঘটবে, তার কারাবাস এখানে ও দেশের বাইরে, উভয় জায়গাতেই জনমনে ক্ষোভ কেবলই বাড়িয়ে তুলবে। এর বিপরীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং “আইনের শাসন” পুনঃস্থাপন করার জন্য তার দেশে প্রত্যাবর্তন একটি বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড. সিদ্দিকীকে যত দ্রুত সম্ভব তার দেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এবং মানবিক কিংবা অন্যান্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে তার সন্তানদের সাথে তার পুনর্মিলন ঘটানো উচিত।

পরিশেষে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ড. আফিয়া সিদ্দিকীর কারাবাসের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেখানে নিষ্ঠুর ও অপ্রচলিত শাস্তির বিপরীতে আমেরিকায় সাংবিধানিক গ্যারান্টি আছে সেখানে বিশ্ব সাক্ষী হয়েছে কিভাবে এই গ্যারান্টিকে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে বারবার লঙ্ঘন করা হয়েছে বিশেষত ৯/১১ এর পরে মুসলিমদের ক্ষেত্রে। ড. আফিয়া সিদ্দিকীর কেইসটি এর ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই মুসলিম নারীর বিপক্ষে করা কেইসটি সাংবিধানিক গ্যারান্টির লঙ্ঘনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

বিদেশের মাটিতে পাঁচ বছরের গোপন কারাবাস এবং নির্যাতনের পর আমেরিকার মাটিতে নিদেনপক্ষে একজন কারাবন্দি হিসেবেও তার প্রাপ্য অধিকার না দিয়ে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেই চলেছে!

আমরা সচেতন নাগরিক ও আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে অনুরোধ করছি, ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে যত দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং যতদিন পর্যন্ত না এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন তাকে পূর্ণ মানবাধিকার (এমনকি একজন বন্দি হিসেবে) প্রদান করা হোক আমেরিকার পেনাল সিস্টেমের আওতায়। যেমন, কারা কর্তৃপক্ষকে তার মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মানসূচক আচরণ করতে হবে, তার জন্য নিয়মিত দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে (যেমন তার পরিবার) এবং তাকে অনুমতি দিতে হবে কার্সওয়ালের দেওয়ালের বাইরে তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকদের সাথে যোগাযোগ করার।

আমাদের এই আবেদন বিবেচনা করতে আপনার সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিবেদক,

দ্য পিস থ্রু জাস্টিস ফাউন্ডেশন

এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে আমেরিকার পরিবারগুলো৷